চতুর্থ অধ্যায়

সত্তর পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের বর্তমান অবস্থান : নির্বাচিত পাঠকৃতির বিশ্লেষণ (১৯৮০-২০০০)

বাংলা উপন্যাসে একটি পরাধীন উপনিবেশিত দেশ-মাটি-মানুষের শেকড়-সন্ধানের সূত্রপাত করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর গোরা (১৯১০) উপন্যাসে। এখানে রবীন্দ্রনাথ এক অখণ্ড ভারতবর্ষের আত্মার মানচিত্রকে তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষের এই মানচিত্র খণ্ডিত নয়, এই ভারতবর্ষে নারী ও পুরুষ, উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ, হিন্দু ও মুসলমান সবারই অধিকার রয়েছে। যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সত্য ভারতবর্ষ', গোরা উপনিবেশের মানুষ, যে-ভারতবর্ষকে সে দেখে, তা তার কাছে বার বার মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয় আর সেই মিথ্যার অভিঘাতে তাড়িত হয়ে সে খুঁজে চলে সত্য ভারতবর্ষকে। বাংলা উপন্যাসে এই সত্যদেশানুসন্ধান প্রক্রিয়াটি চলতেই থাকে ততদিন পর্যন্ত যতদিন না বাংলা উপন্যাস খুঁজে পেয়েছে তার দেশজ রীতি, অন্য এক নতুন আখ্যান।— ব্যক্তি নয় সমষ্টি, একক স্বর নয় বহুস্বর, প্রামাণ্য ইতিহাস নয় অপ্রামাণ্য লোককথা, সরলরৈখিক বাস্তবতা নয় জটিল বহুরৈখিক মহাকাব্যিক বাস্তবতা যে-আখ্যানের বৈশিষ্ট্য। সমালোচক বলেছেন—'সমস্ত আধুনিক ভারতীয় উপন্যাসের জন্ম একটাই বই থেকে, আর তা হলো গোরা'। রবীন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করে বাংলা উপন্যাস লিখেছেন বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা। এঁরা কেউ বাংলা উপন্যাসকে দিলেন প্রকৃতিবাদ, কেউ দিলেন বাস্তবতাবাদ। বাংলা উপন্যাসে এই চলমান ধারাটি বয়ে চলেছে আজও। পরবর্তীকালে সতীনাথ ভাদুড়ি অদ্বৈত মল্লবর্মন প্রমুখ ঔপন্যাসিকরা বাংলা উপন্যাসের আখ্যানে নিয়ে এলেন আর এক ভারতবর্ষকে। যে-ভারতবর্ষের মধ্যেও থেকে গিয়েছিল অন্য এক ভারতবর্ষ, উপনিবেশের ভিতরেও থেকে গিয়েছিল অন্য এক উপনিবেশ, তা হলো নিম্নবর্গের ভারতবর্ষ। যার কথা রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'তেই প্রথম বলেন। তবে ভারতবর্ষের আত্মপরিচয় নির্ণয়ের সে প্রক্রিয়াটি তখনও ছিল অসম্পূর্ণ। প্রথমে প্রকৃতিবাদ তারপর বাস্তবতাবাদের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁদের পরবর্তী ঔপন্যাসিকরা দ্বিতীয়বার বাংলা সাহিত্যে ভারতবর্ষের আত্মার মানচিত্র খুঁজে দেখার চেষ্টা করেন। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে সর্বপ্রথম অন্ত্যজ মানুষের চোখ দিয়ে বাংলা সাহিত্য ভারতবর্ষের দিকে তাকায়।

> ''... শহর, গ্রাম, অভিজাত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, ছাড়িয়ে বাংলা উপন্যাসের ভূগোল সম্প্রসারিত হয় প্রান্তিক জীবনে, অন্ত্যজদের ভারতবর্ষে। হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের অভিজাত সাহিত্যে যে অন্ত্যজরা ছিল অদৃশ্য, তারাই দৃশ্যমান হয়ে উঠল। দৃশ্য ও অদৃশ্য, কেন্দ্র ও প্রান্তের অন্তর্গত বেড়াজাল ভেঙে গেল। ক্ষমতার রাজনীতি যাদের একঘরে করে রেখেছিল, উপনিবেশের ভিতর যারা ছিল আরও সংকীর্ণতর

> উপনিবেশের বাসিন্দা, তাদের আত্মপরিচয়—সন্ধানের মধ্য দিয়েই ধরা পড়তে লাগল সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ" [১]

এরপর সত্তর দশক এবং তার আন্দোলনের ইতিহাস বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। বলা যায় সত্তর পরবর্তী লেখকেরা প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে লিখে বাংলা সাহিত্যের ভূগোলকে আরও প্রসারিত করেছেন।

সত্তর দশক প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে, মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন—

> ''সত্তর দশককে আমি এইভাবে ভাবতে পারি, সেই অসামান্য সময় লেখকদের কি দিয়েছিল আমরা তার কাছে কি নিলাম তাকে কি দিলাম এবং কোথায় আমাদের ব্যর্থতা? প্রশ্নটি শুধু লেখালেখির নয় সমগ্র সত্তার বলেই আমি মনে করি। কোন লেখক কি লিখছেন, কেমন লিখছেন, কখনোই সেখানে সত্তর দশকের ব্যাপার ফুরোয় না।" [২]

মহাশ্বেতা দেবী বা তাঁর সমসাময়িক অনেক ঔপন্যাসিকই সময়ের কাছে দায়বদ্ধতার কথা স্বীকার করেছেন তাঁদের লেখায়। সত্তর পরবর্তী লেখকেরা একটা সময় এসে খুব সচেতনভাবেই কেবলমাত্র পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য কৃশকায় মধ্যবিত্ত ব্যক্তির তরল ও পানসে দুঃখবেদনার পাঁচালি লেখার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। এদের আমরা স্বতন্ত্র গোষ্ঠীভুক্ত করে নিয়েছি অনেক আগেই। এখন দেখা যাক কেন তাঁরা স্বতন্ত্র গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে গেলেন আর এর পেছনে সত্তর দশকের অবদান কতটা। একটা সময় পেশাদার তথা মানবদরদী লেখক হিসাবে সত্তর দশক নিয়ে লেখা তাঁর কর্তব্য বলে দাবি করেছেন মহাশ্বেতা দেবী, কারণ তিনি মনে করেন—

> ''সত্তরের আন্দোলন আমাদের যা দিয়েছে তা সমগ্র দেশকেই দিয়েছে। লেখক দেশের সমাজের এক অংশ মাত্র। আমি লেখক তাই লেখার কথায় ফিরে আসব, কিন্তু দেশের ও মানুষের কথা না বলে উপায় নেই, আমি এই দেশেরই মানুষ, এবং দেশের শুভাশুভে আমার অস্তিত্বও জড়িত। সেইজন্য আর কিছু করতে পারি না বলে আমি লেখক, আমি তো খাদানে কয়লা কাটব না, ক্ষেত মজুর হব না, ভূমিদাস হব না, জঙ্গল নিয়ে লড়ব না, কৃষিক্ষেত্রে নেমে সংগ্রাম করব না। তাই নিজের অস্তিত্বের সমর্থন খুঁজতে আমি লিখি।" [৩]

মধ্যবিত্তের স্যাঁতসেঁতে দুঃখবেদনাকে আশ্রয় করে একটা সময় যখন বাংলা উপন্যাস গতানুগতিক একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল তখন এই বাস্তব-বিমুখ সাহিত্যকে বাস্তবমুখী করেছেন মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়, অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মিত্র, সৈকত রক্ষিত, নলিনী বেরা প্রমুখ লেখক গোষ্ঠী। সাবলটার্ন ডিসকোর্স বা নিম্নবর্গের বয়ান রচিত হয়। 'তল থেকে দেখা' বহুস্তরীয় দ্বান্দ্বিক আখ্যানের জন্ম হয়।

মহাশ্বেতা দেবী 'অগ্নিগর্ভ' উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছিলেন—

> ''বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল বিবেকহীন বাস্তব-বিমুখতার সাধনা চলেছে। লেখকেরা দেওয়ালের লেখা দেখেও দেখলেন না। ফলে, সৎ পাঠকের মনে তাঁদেরও বিসর্জন ঘটছে। বহু সমস্যা, বহু অবিচার, বহুজাতি, বহু লোকাচার সংবলিত দেশের লেখকেরা লেখার উপাদান দেশ ও মানুষ থেকে পান না। এর চেয়ে বিস্ময়কর কি হতে পারে? মানুষের প্রতি এধরনের উন্নাসিকতা সম্ভবত ভারতবর্ষের মতো আধা ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক, বৈদেশিক শোষণে অভ্যস্ত দেশের পক্ষেই সম্ভব।... ইতিহাসের এই সন্ধিলগ্নে একজন দায়িত্ববান লেখককে কলম ধরতেই হয় শোষিতের সপক্ষে অন্যথায় ইতিহাস তাকে ক্ষমা করে না।''

—সত্তর দশকের আন্দোলনের ইতিহাস শুধু একজন লেখককে নয়, কলম ধরিয়েছিল একদল দায়বদ্ধ লেখককে। যাঁরা তাঁদের সাহিত্যের শিকড় সন্ধান করেছেন দেশ, মানুষ, জাতীয় সংস্কৃতির গোড়ায় গিয়ে। তাঁরা ইউরোকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে বাংলা কথাসাহিত্য তথা ভারতীয় উপন্যাসের চাবিকাঠি খুঁজতে চেয়েছেন দেশজ ঐতিহ্যের কাছে। একাজে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন একেবারে দেশের মাটি থেকে উঠে আসা সাহিত্য-লোককথা, মিথ, মঙ্গলকাব্যগুলির উপরিতলের হাজারও ভাঙাগড়ার তলে তলে বয়ে যাওয়া আবহমান জনজীবনের উপর। আর এইজন্যই তাঁরা ইউরোপীয় ভাবনার পরিধির প্রান্তিকতাকে অতিক্রম করে নতুন সম্ভাবনার সেই দুরধিগম্য জনপথগুলিকে উন্মোচিত করতে চেয়েছেন এবং উপন্যাসের কাঠামোয় দেশজ খড়-মাটি-প্রলেপের সার্থক ব্যবহার করে নির্মাণ করতে চেয়েছেন সম্পূর্ণ নিজস্ব এক ভারতীয় আখ্যান প্রতিমা। এই প্রসঙ্গে অভিজিৎ সেন তাঁর 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা' প্রবন্ধে বলেছেন—

> ''সাধারণ ভাবে বলতে গেলে মিথ বা লোককথার বহুমাত্রিক ব্যবহার আমাদের সাহিত্যে এখনও খুবই নতুন। সত্তর দশকের 'গ্রামে চলো' ব্যাপারটা অন্য অনেক কিছুর মতো শিল্প-সাহিত্যেও একটা ওলোটপালট করেছে মনে হয়।... ফলে অন্য মাধ্যমগুলোর মতো গল্প উপন্যাসেও একটা অবলম্বন আমরা খুঁজতে চেয়েছি যা ঠিক ইউরোপীয় নয়। ভারতবর্ষীয় মিথ, পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, লোককথার উপাদান, পুরুলিয়া বাঁকুড়া বীরভূমি উত্তরবঙ্গের উপভাষা, এমনকি কোনও উপভাষার ঢঙে তৈরি কৃত্রিম বাক্যরীতিরও ব্যবহার আজকাল লেখাতে আমরা করি। ... ইউরোপীয় নয় বরং তৃতীয় বিশ্বের গল্প উপন্যাস কবিতার সঙ্গেই এই নতুন বিষয় ও রীতির মিল। ... লোককথা, লোকসঙ্গীত এবং লোকশিল্পের সেই অবাধ শৈলী আমি আত্মস্থ করতে চাই যা দিয়ে পণ্ডিত এবং অপণ্ডিত—সবাইকেই মুগ্ধ, বিস্মিত এবং প্লাবিত করা যায়।... আধুনিক বাস্তবতার যতরকম রূপ আছে, তার সবকটির মধ্যেই গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে সুস্থ জীবনবোধকে ধ্বংস করবার প্রবণতা আছে বলে, অনেকের মতো আমারও মনে হয়।... সুস্থ জীবনবোধ

> জাগ্রত করার জন্য মঙ্গলকাব্যের বাস্তবতা কিংবা লোককথার বাস্তবতাকে নতুন যুগোপযোগী করে নিয়ে আসতেই আমার এবং আমার মতো আরও অনেকেরই লক্ষ্য থাকবে।... লোককথা, লোককথার ঢং, মিথের অলৌকিক বাস্তবতা—এসবের মধ্যেই নতুন চিন্তা ও চেতনার সন্ধান হয়ত পাওয়া যাবে, যার সাহায্যে আমাদের সাহিত্যের বর্তমান বন্ধ্যা দশা হয়ত ঘুচতে পারে।"

অর্থাৎ আত্মবিস্মরণের পরিবর্তে বিপরীত প্রক্রিয়ায় শুরু হয়েছে আত্মানুসন্ধান। যখন দেউলে হয়ে যাওয়া তথাকথিত তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে শোনা যাচ্ছে আত্মখননের শব্দ তখনই বহুদিন আগে ফেলে আসা জনপথগুলির মতোই অবহেলা, অস্বীকার আর বিস্মৃতির ধুলোয় চাপা পড়ে যাওয়া নিম্নবর্গীয় জনজীবনের ইতিহাস আবার উন্মুক্ত হচ্ছে। বাংলা উপন্যাসের আধারে সচেতন পাঠক কান পেতে শুনতে চাইছে তার নাভির স্পন্দন—এই সময় চিহ্নিত করতে কিছু উপন্যাসের আলোচনা দরকার, তাহলে পরিবর্তনের অভিমুখটি আরও স্পষ্ট হবে।

টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা : প্রান্তিক আদিবাসী ভুবন

আমরা জানি মহাশ্বেতা দেবীর সূত্রে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার কেন্দ্রে চলে এসেছে প্রান্তিক আদিবাসী জনগোষ্ঠী। মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী চিন্তনের প্রথম সাহিত্যিক স্ফুরণ ঘটে—'কবি বন্দ্যঘটী গাঞীর জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসে। 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞীর জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসের সময়, পটভূমি ও বিষয়ভাবনা একেবারে স্বতন্ত্র—লৌকিক জীবন-ব্যবস্থার আলোকে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ, তবে আদিবাসীদের সমাজ-ব্যবস্থা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতিচেতনা, সভ্যতা সব মিলিয়ে আদিবাসী জগৎ 'বিশেষ এক বিপন্নতার আধারে রচিত হয়েছে মহাশ্বেতা দেবীর 'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' (১৯৮৯) উপন্যাসে। ভেরিয়ার এল্যুইন—তাঁর আদিবাসী জগৎ সম্পর্কে একই চিন্তন থেকে বলেছেন—

> ''আদিবাসী মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যই আমার জীবনের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় মূল্যবোধের অধিকাংশ জন্মেছে, বেড়ে উঠেছে। আমি ওদের ওপর যত না প্রভাব বিস্তার করেছি, ওরা আমার ওপর তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। আনন্দের গুরুত্ব, সরলতার গুরুত্ব ওরাই শিখিয়েছে আমাকে। বর্ণ ও ছন্দের প্রতি ওদের আসক্তি আমার মনে সাড়া তুলেছে" [৪]

বলা যায় 'টেরোড্যাকটিল পূরণ সহায় ও পিরথা' উপন্যাসেও এই আদিবাসী ভাবাদর্শ প্রোজ্জ্বল। কারণ লেখক নিজেই তাঁর এই উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন—'আমার স্বোপার্জিত আদিবাসী অভিজ্ঞতার বাণীরূপ মাত্র'। মহাশ্বেতার বহু লেখায় বিধৃত হয়েছে আদিবাসী জীবন। আদিবাসী

সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্কের কথা সবার জানা। তিনি আদিবাসী সম্প্রদায়েরই একজন হয়ে তাদের কথা লিখেছেন তাঁর বহু রচনায়। 'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' লেখকের বহু আলোচিত উপন্যাসগুলির তালিকায় পড়ে না। উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি বলেছেন তাঁর 'আদিবাসী অভিজ্ঞতার শেষ সিদ্ধান্ত এ লেখার উপজীব্য'।

১৯৮৭-র শারদ প্রতিক্ষণ পত্রিকায় এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের ভূমিকায় মহাশ্বেতা লিখলেন—

> ''বক্তব্যটির সারাংশ এইরকম, মেসোজোয়িক যুগের টেরোড্যাকটিল যদি আজ হাজির হত, আজকের মানুষ তাকে বুঝতে সক্ষম হত না। টেরোড্যাকটিলকে মরতেই হত, কেননা ফেনোজোয়িক পৃথিবী তার অজ্ঞাত বিলুপ্ত পৃথিবী ও বর্তমান পৃথিবীতে সংবাহন সম্ভব নয়। আদিবাসীদের সমাজব্যবস্থা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতিচেতনা, সভ্যতা, সব মিলিয়ে যেন নানা সম্পদে শোষিত এক মহাদেশ, আমরা মূলস্রোতের মানুষেরা সে মহাদেশকে জানার চেষ্টা না করেই ধ্বংস করে ফেলেছি, তা অস্বীকার করার পথ নেই। ... কিন্তু আদিবাসীদের যে বিশেষ সমস্যা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তা হল তাঁদের ভাষা আছে লিপি নেই। তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য Oral Tradition-এ বিধৃত। লিপি এখনও প্রায় অনুপস্থিত। ... আর মূলস্রোতের ধাক্কায় এঁদের বারবার দেশান্তরী হতে হয়েছে। ফলে অনেক কিছু গেছে হারিয়ে। মূলস্রোত, এই বিষয়ে যে অপরাধে অপরাধী তার ক্ষমা নেই। অধিবাসীরা আজ, আদিবাসী সত্তার ন্যায্য স্বীকৃতি চান, তা তো দেখতেই পাচ্ছে ভারতবর্ষ আর এই দাবীর মধ্যে বঞ্চনার, তাদের সত্তার স্বীকৃতি না পাবার, মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হবার, বারবার ব্যবহৃত হবার ব্যাপারটা এক তিক্ত সত্য।''

'টেরোড্যাকটিল পূরণ সহায় ও পিরথা' উপন্যাসটি লেখা হয়েছে মধ্যপ্রদেশের পিরথা ব্লকের পটভূমিকায়। এই ব্লকের অধিকাংশ মানুষ আদিবাসী। এই আদিবাসীরা নাগেসিয়া সম্প্রদায়ের। পিরথা ব্লকে এসেছে পূরণ। সে একজন সাংবাদিক 'পাটনা দিবসজ্যোতি পত্রিকার। সে চায় এখানকার দুর্ভিক্ষাবস্থার ওপর এক প্রতিবেদন লিখতে। পূরণের চোখ দিয়েই আমরা দেখি আদিবাসী জীবন-সংগ্রামের মর্মন্তুদ চিত্র; সামাজিক বঞ্চনা ও রাষ্ট্রীয় শোষণের ভেতর তাদের বিপন্নতার ছবি। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে লোক মরছে অথচ পিরথাকে সরকারিভাবে দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চল বলা যাবে না, বলতে হবে খরা অঞ্চল। সরকার এখান স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলতে দেয়নি। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, পাহাড় গড়িয়ে জল পড়ে। তাতে মিশে যায় বিষাক্ত কোনো কিছু। সেই জল খেয়ে আন্ত্রিকের শিকার হয় তারা। অথচ আন্ত্রিকের রোগীদের টাউনে নিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলে। এ অত্যাচারের কোনো প্রতিকার নেই। এছাড়াও কৃষিভূমি নেই এখানে।

পিরথার একটা জায়গায় জোরে জল নামে। সেখানে বাঁধ দিলে চাষাবাদ হতে পারত, কিন্তু তা হয় না। পিরথায় 'জল সারপ্লাস' বলে সরকারি ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি টিম খুব বর্ষায় দেখতে আসে। অথচ গরমে সেখানে ভয়ংকর জলকষ্ট, দুটো কুয়ো তাও সেখানে সামান্য জল। পিরথার লোকেরা কেবল বর্ষাকালে যথেষ্ট জল খেতে পায়। দারিদ্রের কারণে আত্মহত্যা করে আদিবাসীরা, আর আদিবাসী উন্নয়নের টাকায় তৈরী হয় রোড, বাংলো। আদিবাসীরা মরলেও, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে না পৌঁছালে তার খবর পায় না সরকার। মৃত্যুর খবরেও সরকার অকাল ঘোষণা করে না। কারণ, একটা বিশেষ পারসেন্টেজে মানুষ না মরলে অকাল ঘোষণা করা যায় না। প্রতিবছরই মানুষ এখানে মরে। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে, জলাভাবে। এরসঙ্গে রয়েছে প্রশাসনিক ক্ষমতার স্তরবিন্যাস, গরিবি হটাও প্রচারের অসারতা; আর প্রদর্শিত হয়েছে লোকহিতৈষণার নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সঙ্গে কায়েমি স্বার্থের নিগূঢ় সংযোগ।

পুরণ দেখে অনাহারে তিলে তিলে মরে মানুষ। আর শহুরে বাবুরা আসে এই ভুখা-নাঙ্গা মানুষদের ছবি তুলতে। পূরণ বোঝে খেতে না পাওয়া এই কঙ্কালসার মানুষগুলির ছবি তুলে 'ফিলিম' বানানো কতবড় অসভ্যতা। আর সে ভাবে, সাংবাদিকরা কেন ওড়িসার কালাহাণ্ডি নিয়ে লেখে, পিরসা নিয়ে লেখে না। কাহিনি থামিয়ে সমাজসেবী, চিন্তক মহাশ্বেতা আদিবাসী বিপন্নতার নানান সংবাদ দিয়েছেন। এ শুধু পিরথার ঘটনা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের আদিবাসীদের বিপন্ন অবস্থানের স্থির চিত্র। এ তথ্য শুধু পিরথার নয়। লেখক এখানে সমগ্রদেশের আদিবাসী জনজাতির অবস্থাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বাস্তবে পিরথা নামে মধ্যপ্রদেশে কোন ব্লকের অস্তিত্ব নেই। কারণ এরা 'না রাজের', 'না মানুষ' সরকার তাদের অস্বীকার করে। পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসটির শেষে লেখক মন্তব্য করেছেন—

> ''এই লেখায় মধ্যপ্রদেশ, নাগেসিয়া কোনটিই আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। মধ্যপ্রদেশ এখানে ভারতবর্ষ, নাগেসিয়া জনপদ সমগ্র আদিবাসী সমাজ। বিভিন্ন অস্ট্রিক আদিবাসী জাতি জনজাতি ও গোষ্ঠীর আচার প্রথা রীতি আমি ইচ্ছে করেই মিলিয়েছি এবং পূর্বপুরুষের আত্মা ব্যাপারটিও এখানে আমার কল্পনা। টেরোড্যাকটিল মিথ দিয়ে ভারতের আদিবাসী সমজের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাজাত সিদ্ধান্তটি বলতে চেয়েছি মাত্র।'' [৫]

তাই উপন্যাসটিতে প্রয়োজন মতো অন্যান্য অস্ট্রিক জাতির মিলিত মিশ্রিত প্রতিনিধিত্বমূলক একটা চেহারা এনেছেন নাগেসিয়াদের মধ্যে। আর পূরণ যখন পিরথায় আসে তখন শোনে এক অদ্ভুত কাহিনি : জ্যোৎস্নালোকিত এক রাতে এখানকার আদিবাসীরা অদ্ভুত এক পাখির ছায়াকে ভাসমান দেখেছে—

> ''খুব বড় নয়, খুব ছোট নয় এক পাখি। পাখিটা 'ঢেউয়ের মতো ভাসছিল, দুলে খানিক নামছিল, আবার একটু উঠছিল। ওরা মুখ তুলে দেখে খুব ভয় পায়।... ছায়াটা ওদের সঙ্গে চলছিল।"

বিথিয়া পাখিটার ছবি আঁকে, খোদাই করে রাখে গুহায়। আর আদিবাসীরা তখন পূর্বপুরুষদের আত্মার মৃতাশৌচ পালন করে। এই মিথের সূত্র ধরেই শংকরের বয়ানে লেখক পৌঁছে যান আদিবাসীদের মৌখিক ইতিহাসের শেকড়ে—

> ''একটা সময় আদিবাসীরাই ছিল শুধু। বন ছিল, পাহাড় ছিল, নদী ছিল, আর তারা ছিল, জমি ছিল, ক্ষেতে আবাদ হত—ধান কোদো কুটকি সোনা ফল, ক্ষেতে। সংসার বেড়ে গেলে কিছু মানুষ চলে যেত দূরে। পৃথিবীর কাছে বলে নিত, 'ঘর বাঁধতে খুঁটি পুঁতছি, চাষ করব তাই জমি হাসিল করব' সমাজপতি বলে দিত কোথায় বসত করতে পারবে। সেইখানে বেঁধে নিত ঘর, গড়ে নিত গ্রাম। যে যার মতো জমি হাসিল করত। গাছ তাদের গ্রামদেবতা, গাছকে পূজা দিত। তখন শুধু তারা ছিল। আদিবাসীরাই ছিল শুধু"

তাই শংকরের আক্ষেপ—

> ''কেন এল ভিনদেশি মানুষ? আমরা রাজা ছিলাম, প্রজা হলাম। প্রজা ছিলাম দাস হলাম। অঋণী ছিলাম দেনাদার করে দিল। দাস করে বেঁধে রেখে দিল হায়! নাম দিল হরোয়াহি, নাম দিল মহিদার, নাম দিল হালি, নাম দিল কামিয়া। দেশ চলে গেল, ঝড়ের মুখে ধুলোর মতো চলে গেল জমি, ঘর, সব। যারা এল তারা তো মানুষ নয়। হায় হায়! পাহাড়ে উঠে ঘর বাঁধি, রাস্তা আমাদের তাড়া করে আসে। অরণ্য চলে যায়। চারিদিকে ওরা অশুচি করে দেয়। পূর্বপুরুষের সমাধি ছিল। হায় হায়! তা গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে সেখানে হল পথ, বাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল, এর কোনটা আমরা চাইনি। আমাদের জন্যও করেনি। ... আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছি, মুছে যাচ্ছি মাটি থেকে। তাই পূর্বপুরুষদের অশান্ত আত্মা এখন ছায়া ফেলে ঘুরে যাচ্ছে।" [৬]

এই ছায়াই আসলে টেরোড্যাকটিল, ভারতবর্ষের আদিবাসীদের বিশেষ বিপন্নতার কথা বোঝানোর জন্য চোদ্দ কোটি সত্তর লক্ষ বছর আগের এই প্রাণীটির খবর জানানো হয়েছে এবং উপন্যাসের প্রয়োজনেই টেরোড্যাকটিলের মিথিক্যাল প্রবেশ ও প্রস্থান ঘটেছে। লেখক এ প্রসঙ্গেই বলেছে, মেসোজোয়িক যুগের টেরোড্যাকটিল যদি হাজির হত, আজকের মানুষ তাকে বুঝতে সক্ষম হত না। মরতেই হত তাকে। কারণ মেসোজোয়িক পৃথিবী তার অজ্ঞাত। বিলুপ্ত পৃথিবী ও বর্তমান পৃথিবীতে সংবাহন সম্ভব নয়। উপন্যাসে লেখক সে-কথায় বলেছেন।—

> ''আদিবাসীদের সমাজব্যবস্থা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি চেতনা, সভ্যতা সব মিলিয়ে যেন নানা সম্পদে ভরা এক মহাদেশ, আমরা মূলস্রোতের মানুষেরা সে মহাদেশকে জানার চেষ্টা না করেই ধ্বংস করে ফেলেছি তা অস্বীকার করার পথ নেই।''

তাই ওদের সঙ্গে থাকতে থাকতে মূলস্রোতের প্রতিনিধি পূরণ মনে প্রাণে নাগেসিয়াদের একজন হয়ে উঠতে চেয়েও পারেনি। কারণ পত্রকার পূরণ ও বিথিয়া উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের অধিবাসী—দুয়ের মধ্যে মিলনের কোনও কেন্দ্রবিন্দু নেই। পূরণ তবু নিরস্ত হতে পারে না কারণ লেখকের উপলব্ধি তার উপলব্ধি। তাই সে জানে এর জন্য প্রয়োজন

> ''ভালোবাসা, প্রচণ্ড নিদারুণ, বিস্ফোরক ভালোবাসা পারে এ কাজে এখনও আমাদের ব্রতী করতে শতাব্দীর সূর্য যখন পশ্চিম গগনে, নইলে ভীষণ দাম দিতে হবে এই আগ্রাসী সভ্যতাকে।''

এভাবেই আদিবাসী সত্তার নির্মাণ ঘটিয়েছেন, বিরোধী ও প্রতিস্পর্ধী ইতিহাসভাষ্য তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা দেবী। কিন্তু শেষ অবধি আমরা লেখককে বলতে শুনি—'আদিবাসী সমাজ নিয়ে যন্ত্রণাবোধ দীর্ঘকাল আমায় দগ্ধ করে, সে দহন আমার সঙ্গে চিতা অবধি যাবে।' এ যন্ত্রণা, তাঁর সময়ের। বলা যায় এ দহন তাঁর সময়ের সমগ্র লেখকগোষ্ঠীর।

রহু চণ্ডালের হাড় : ওরা ব্রাত্য

সত্তর দশকের প্রভাব ছিল এই সময়ের অন্য লেখকদের মতো—ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেনের (১৯৪৫) অভিজ্ঞতায়, তিনি সত্তর দশক এবং তার আন্দোলনগুলির প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন—

> ''ষাটের শেষ এবং সত্তরের প্রথম পর্বের সব থেকে বড় আন্দোলন যাকে আমরা সত্তর দশকের আন্দোলন বলি। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল প্রথম থেকেই। চাকরি এবং ঘর ছেড়ে গ্রামে চলে যাই আমি। এই আন্দোলনে পেশাদার হিসাবে যোগ দিয়েছিলাম আমি প্রায় প্রথম থেকেই। এই আন্দোলনের অংশীদার হওয়াতে একটা নির্দিষ্ট সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আমার অবশ্যই হয়েছিল। আন্দোলনের আগ্রগতি বিপর্যয় এবং পরাজয়ের স্তরগুলিতে অন্য সবার মতো আমারও উপলব্ধির পরিবর্তন হয়েছে। সত্তর দশকের আন্দোলনে বিপর্যয়, পরাজয় এবং পর্বত প্রমাণ ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও যে পরিবর্তনের চিহ্ন রেখে গেছে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তা বিরল। এই আন্দোলন চলাকালীন যথার্থভাবে গ্রামের অন্তরাত্মার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হয়'' [৭]

গ্রাম বাংলার বাইরের পরিবর্তন তিনি দেখেছেন, দেখেছেন বামফ্রন্টের অপারেশান বর্গা কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণ। আর দেখেছেন অপরিবর্তনীয় সমাজ সংস্কৃতির অন্তর্বয়ন। যার প্রভাব তাঁর উপন্যাসে এক বিকল্প আধুনিকতার আদল এনেছে। তার 'রহু চণ্ডালের হাড়' (১৯৮৫) উপন্যাসটিতে আছে এই বিকল্প আধুনিকতার আদল। তাই এই উপন্যাসটিকে বলা ব্রাত্য বিকল্প বাস্তবের কাহিনি, জীবন সংগ্রামের কাহিনী। অভিজিৎ সেন যে সচেতন শিল্পী তার স্পষ্ট ছাপ আছে 'ছায়ার পাখি' (১৯৯৩), 'আঁধার মহিষ' (১৯৯৩), বিদ্যাধরী ও বিরাগী লখিন্দর' (১৯৯৫) উপন্যাসে। তবে যখন 'রহু চণ্ডালের হাড়' (১৯৮৫) উপন্যাসটি প্রকাশিত হল, আখ্যান উপস্থাপনের অভিনবত্ব বিষয়বস্তুর বদল একটা চমক সৃষ্টি করল। আত্মকথার ঢঙে এ যেন বাজিকর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিপুল তথ্য ভাণ্ডার। আমরা জানি বিকল্প আধুনিকতার একটা আবিস্কার সব সময়ই সঞ্চিত থাকে বিপুল তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিতে। তবে সে তথ্য তত্ত্ব বহুল নয়, সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ হতাশা ব্যঞ্জনার ইতিবৃত্ত।

উপন্যাসে লেখক তুলে এনেছেন এক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন ইতিহাস। লেখক যাদের বলেছেন বাজিকর। বাদিয়া বাজিকরদের স্থিতির খোঁজে কয়েকশো বছর ধরে ভূ-পরিক্রমণের ঐতিহাসিক আখ্যান 'রহু চণ্ডালের হাড়', বাজিকরের ঐতিহাসিক-পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে বাজিকর জীবনের মিথ কিংবদন্তী আর বাস্তবতা মিলেমিশে জট পাকিয়ে তৈরি হয়েছে এক জটিল বাস্তবতা। বাজিকর গোষ্ঠীর আদিম পূর্বপুরুষ রহু, বলা যায় রহুচণ্ডাল বাজিকর জীবনে এক পৌরাণিক চরিত্র। রহুর বংশধরদের তিন চার পুরুষের বিবর্তনের ইতিহাসের সূত্র ধরেই এ উপন্যাসের কাহিনির বিস্তার। রহুচণ্ডালের মিথের আবহে উপন্যাসটি পল্লবিত হয়েছে এক যাযাবার জনগোষ্ঠীর কৃষি সভ্যতায় উত্তরণের ইতিহাস হয়ে। কিংবদন্তীর ছত্রছায়ায় ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ হয়েছেও বলা যায়। মূলত যাযাবরদের জীবনসংগ্রামের কাহিনি 'রহু চণ্ডালের হাড়'। লোককথা, লোকজীবন মিথকে আশ্রয় করে আখ্যান চলেছে সরলরৈখিকভাবে। আর তার মাঝে এসেছে জট জটিলতা, প্লটের বহুরৈখিক বিন্যাস আর এর ভেতরে ভেতরে লেখক খুঁজে চলেছেন রহুচণ্ডালের হাড়কে ঘিরে তাদের কিংবদন্তী স্বপ্ন-বিশ্বাস আর গ্রামসমাজে এই অন্ত্যজ মানুষগুলির প্রকৃত অবস্থান। লেখক বলছেন—

> ''আমি লোককথায় আখ্যান ও উপন্যাসকে নানা ভাবে বিন্যস্ত করি। আখ্যানের অংশ আখ্যানের চরিত্র, গান ছাড়া মঙ্গলকাব্য-তার রহস্যময় বাস্তবতা, যা আমাদের প্রকৃত মানুষের চরিত্রকে ধরতে বুঝতে ভীষণভাবে সাহায্য করে, এসবও আমি উপন্যাসে আনি। ... সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিন্যাসকে বুঝতে সাহিত্য যদি কিছু সাহায্য করে তাহলে লোকজীবন, লোককথা, মিথ, মন্ত্রবান ইত্যাদির সঙ্গে এখন পর্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত মানুষকেই খুঁজতে হবে, ... আমি এসব বিষয় ও

সেই বিষয়-আশ্রিত যোগ্য আঙ্গিকটিকেই আমার কিছু গল্প উপন্যাসে খুঁজতে চেষ্টা করেছি।”[৮]

উত্তরবাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বাজিকর গোষ্ঠীর অবস্থান কোথায় তা কিন্তু নির্দিষ্টভাবে লেখক উল্লেখ করেননি। মূলত দনুর সময় অর্থাৎ তাদের অতীত কাল থেকে ১৯৬৭-র নির্বাচন পর্যন্ত বাজিকরদের কয়েক প্রজন্মের সময়কালে, তাদের জীবনযাত্রা উঠে এসেছে এ উপন্যাসে। বাজিকর বংশ-তালিকাটি এরকম—

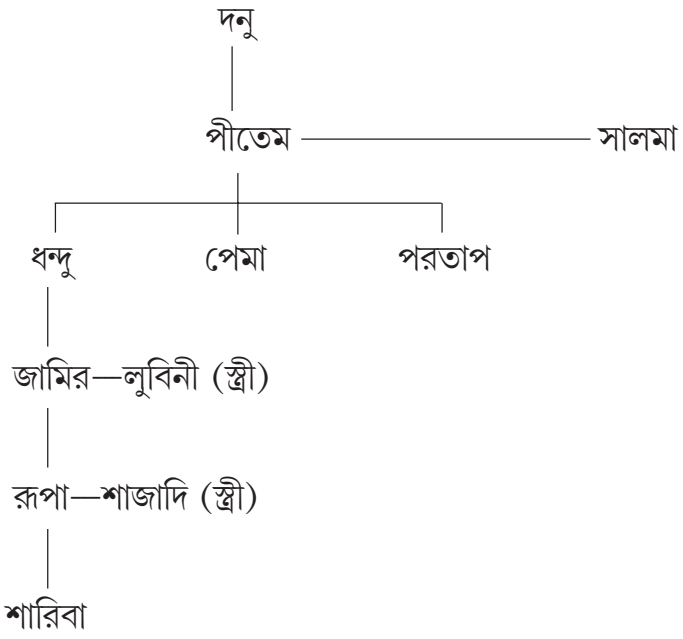

লুবিনী এই উপন্যাসের কথক। বাজিকরদের তিনচার পুরুষের বিবর্তনের ইতিহাস আমরা তার সূত্রেই জানতে পারি। লুবিনির বর্ণিত কাহিনিকে আখ্যানের পর আখ্যান জুড়ে নিয়ে তৈরি হয়েছে এ উপন্যাসের কথনবিশ্ব। এর শ্রোতা শারিবা, লুবিনির নাতি, বহুবছর ধরে পথেপ্রান্তে কাটানো বাজিকর জীবনসংগ্রামের ইতি-বৃত্তান্ত লুবিনি শোনায় শারিবাকে। এর ভেতর থেকেই উঠে আসে বাজিকর গোষ্ঠীর অন্তরালবর্তী হারানো ইতিহাস। লুবিনির পূর্বস্মৃতি থেকে পিতমের মুখে শোনা বাজিকরদের অতীত কাহিনি, লুবিনির সময় থেকে শারিবার সময় হয়ে দুনু থেকে শারিবা পর্যন্ত সমগ্র সময়সীমাকে আশ্রয় করে উপন্যাসটি একটি নতুন কিংবদন্তি গড়ে তোলে। রহুর কাহিনিকে আশ্রয় করে কিংবদন্তির ছত্রছায়ায় ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ঘটে। মূলত পীতেম বাজিকরের জীবনযাত্রার কাহিনি দিয়েই এ উপন্যাসের যাত্রা। পীতেম হল বাজিকর গোষ্ঠীর দলপতি। তার কাহিনি প্রথমে উপন্যাসে পূর্বস্মৃতি থেকে হয়ে যায় প্রধান কাহিনি। পীতেমের কাহিনি হল একদল যাযাবর মানুষের মাটিতে শেকড় গেড়ে গেরস্থ হতে চাওয়ার কাহিনি। যেখানে আছে স্বপ্ন, আশা, হতাশা, যন্ত্রণা, বঞ্চনা, অত্যাচার ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা।

> ‘‘নীচু দাওয়া, তালপাতার বেড়া দেওয়া ঘর, সরকারি ফরেস্ট থেকে চুরি করে আনা শনের চালা, সেই নীচু গুহার মতো ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার পর স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘন তরলতায় জমে থাকে, লুবিনি তখন কাঁপা কাঁপা গলায় প্রাচীন কথা বলে।’’

শারিবা শোনে সে কাহিনি বোঝার চেষ্টা করে আর তার অপুষ্ট বুদ্ধিতে শুনে শুনে বর্তমানের সাথে অতীতের যোগসূত্র রচনা করে। ‘শারিবার যখন বছর বারো বয়স, তখন নানি লুবিনির সঙ্গে তার গভীরতর সখ্য হয়,’। তবুও শারিবা বোঝে অনেক, কারণ পথে ঘুরে ঘুরে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে। নানি লুবিনির স্মৃতি কথা শুনতে শুনতেই শারিবা বড়ো হয়, লুবিনি তাকে বলে এক অজ্ঞাত দেশের কথা—

> ‘‘সি দ্যাশ হামি নিজেই দেখি নাই, তোক্ আর কি কমো। সি দ্যাশের ভাষা বাজিকর নিজেই বিসোরণ হোই গিছে তোকে আর শিখামো’’

সে এক অপরিচিত দেশ। যেখানে ঘর্ঘরা নামে এক পবিত্র নদী বয়ে যায়। যেখানে নাকি কবে এক শনিবারের ভূমিকম্পে সব ধূলিসাৎ হয়েছিল। আর তাতে বাজিকরদের জীর্ণ বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছিল। সে এক কালো অন্ধকারের শনিবার, যা লুবিনি নিজে দেখেনি, তার নানাশ্বশুরের থেকে শুনেছে। লুবিনির শ্বশুর পিতেম বাজিকর যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ী জীবনের স্বপ্ন দেখত। শনিবারের ভূমিকম্পের পর ঘর্ঘরার উত্তর তীরে সরে গিয়ে পীতেম তার দলবল নিয়ে ডেরা তোলে যে-গ্রামে, সে-গ্রামটা ছিল গোয়ালাদের। তারা বাজিকরদের বলে ‘হেথায় থাকা চলবে না; তাদের হাতে ছিল মোটাসোটা বাঁশের লাঠি যা দিয়ে তারা খেপা ষাঁড় ঠাণ্ডা করে জঙ্গলের জানোয়ার তাড়ায়।’ তখন দলপতি পিতেম ভাবে যাব কোথায়? খাব কি? দলকে বাঁচাবে কি করে। স্বপ্নে পায় মরা বাপ দনুর নির্দেশ—‘পীতেম হে, পীতেম পূবের দেশে যাও বাপ। সিথায় তুমার নসিব’। সেই কবে থেকে বাজিকরের পূর্বের দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা। পূবের দেশে সাহেবদের তখন বড়ো হাঁকডাক, পীতেম লুবিনিকে বলেছিল শনিবারের ভূমিকম্পের কথা, ডেহরিঘাট, সিওয়ানের কথা। তারপর রাজমহলের কথা। রাজমহলের গঙ্গার ধারে বাজিকরের ছাউনি পড়ল সারি সারি। রাজমহল তখন গমগমা জায়গা। এখানে সেখানে রেলের লাইন বসছে। গঙ্গায় শয়ে শয়ে মহাজনি নৌকা। পিতম দলকে বলে ‘এ হল সেই পূবের দেশ। গোরখপুরের ঠিকানা তো উঠেছে। নতুন ঠিকানা বানাতে হবে’। রাজমহল, বারহেট, তিন-পাহাড়, সাহেবগঞ্জের হাটে বাজারে পীতেমের দল রঙিন কামিজ আর ঘাঘরা উড়িয়ে নতুন বিহ্বলতা আনে। আসলে বাজিকরের কোনও ভাষা বা ধর্ম নাই। যখন যে-দেশে ঘোরে সেখানের ভাষায় কথা বলে, সেখানকার ধর্ম-কর্ম শিখে নেয়। আর তাদের কাজ হল ভিখ্‌মাঙ্গার কাজ, দেশে দেশে ঘুরে বাঁদর নাচানো, ভাল্লু নাচানো, পিচ্‌লু বুঢ়া, পিচ্‌লু-বুড়ির কাঠের পুতুল নাচানো, ভানুমতির খেলা, বাঁশবাজি,

দড়িবাজি, নররাক্ষস হয়ে কাঁচা হাঁস কাঁচা মুরগা কড়মড় করে খাওয়া, এভাবে নাচ গান করে ভিক্ষা করা তাদের কাজ। পীতেম বাজিকর পূর্বের এই দেশটাকে ভালোবেসে ফেলেছিল তাই সে তার দলবল নিয়ে শেষবারের মতো গোরখপুর ত্যাগ করার পর এই দিকে এসেছিল। পীতেমের আগেও বাজিকরেরা এদেশে আসত। কিন্তু সে করতে চাইল চিরস্থায়ী গৃহস্থালি। বাজিকর এদেশের মতো এমন অঢেল জমি, ধান এবং জল তার পরিচিত ভুমণ্ডলে কোথাও দেখেনি। যদিও বাজিকরের পরিচিত ভূমণ্ডল খুব ছোটো ছিল না কিন্তু সেখানে শস্যদানার খুব অভাব। বাজিকর সারাদিন জন্তু জানোয়ার নাচিয়ে, দড়িবাজি, বাঁশবাজি করে ভিক্ষামেঙ্গে সন্ধ্যায় যে শস্যদানা পায় তাই খোলা আকাশের নীচে বসে ফুটিয়ে নেয়, এই তাদের খাওয়া। এই জন্যই বাজিকরদের কল্পনায় 'বাউদিয়ার' স্বর্গে অঢেল খাবার বন্দোবস্ত।

পীতমের কাহিনি পূর্বকাহিনি থেকে ক্রমশ প্রধান কাহিনি হয়ে যায়। রাজমহলে অবস্থানকালে বাজিকর দেখে, এমন জায়গা বাজিকরের উপযুক্ত। নতুন বসতি নতুন মানুষ। সাহেব পুলিশ মুন্সি মহাজন, শুঁড়ি, কয়াল, দোকানদার মোদক, দালাল সব মিলে ব্যাপক লুঠের বন্দোবস্ত। এইরকম হাটের মাঝখানে বাজিকরদের খেলা জমে ওঠে। পীতম তার দলের কিছু লোককে ছড়িয়ে দেয় হাটের মাঝে। রূপা-তামা-পেতল রঙের জিনিসের বদলে তারা পায় খাদ্যশস্য ও তৈলবীজ। এসব দেয় কারা? তারা সাঁওতাল, হড়। পীতেম দেখেছিল রাজমহল, বারহেট, আমগাছিয়া, পিপড়া ইত্যাদি শহর গ্রামে-হাটে এই সব মানুষ দ্রব্য বিক্রি করতে আসে। এই জটিলতা বর্জিত মানুষগুলোকে ঠকায় গোলাদার মহাজন সকলেই। পীতেম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছিল এরা বাদিয়া বাজিকরের মতো নয়, আবার সাধারণ গৃহস্থের মতোও নয়। প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত খেটে খাওয়া মানুষ এরা। পাহাড় ভেঙে জঙ্গল পরিষ্কার করে অবিশ্বাস্য নিষ্ঠায় তারা ফসলের জমি তৈরি করে। আর সেই জমি ভোগ দখল করে অর্থলিপ্সু ধনবান মানুষ। বাজিকর যুবক পরতাপ জিল্লুর সূত্রেই সাঁওতালদের জীবনচিত্র উঠে আসে, সাঁওতাল পরগণা ও লক্ষণ সোরেনের সঙ্গে পরিচিত হয় পীতেম বাজিকর। বাজিকরের সঙ্গে গৃহস্থ মানুষের বন্ধুত্ব হয় না। কারণ তারা পথের মানুষ। কিন্তু এই সাঁওতালদের সঙ্গে বাজিকরদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়। উঠে আসে সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রসঙ্গ। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সাঁওতাল পরগণার লক্ষণ সোরেনই দৃঢ়বদ্ধ ভাবে পীতেম বাজিকরের মধ্যে গৃহস্থ হবার বীজ রোপন করে। লক্ষণ সোরেন আক্ষেপ করে। এখন সময় খারাপ তাই বাজিকরকে সে জমিতে বসত করাতে পারে না—

> ''পাঁচবছর আগেও কত মানুষকে বসত করিয়েছি জঙ্গল কেটে, পাথর চটিয়ে চাষের জমি পত্তন করে দিয়েছি। এখন আর সে দিন নেই। সব জমির মালিক তৈরি হয়ে গেছে। জঙ্গল কেটে জমি যেই খালাস হল তখনই মালিক এসে হাজির হবে। দেও তখন তাকে ভাগ দেও। আর সে ক্রমশ সর্বস্ব হয়ে যায়।"

যে-ফসল তারা ফলায় তাতে খাবলা মারে—জোতদার, গাঁতিদার, গোলাদার মহাজন সকলেই। এসকল কথা বাজিকর জানে, সেজন্যই বাজিকর জমিতে বসত করতে চায় না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও লক্ষণ সোরেন পীতেমকে বলে—'জমিতেই স্থিতি, জমিতেই স্থায়িত্ব, জমিতেই সুখ। জমি না থাকলে জীবনের কোন অর্থই হয় না।' এভাবেই লক্ষণ সোরেন বাজিকরকে জমিতে স্থিতু হবার স্বপ্ন দেখায়। আর—

> ''পীতেম জানলো না যে এক জ্যৈষ্ঠ মাসের নক্ষত্র খচিত রাতে খোলা আকাশের নিচে লক্ষণ সোরেন যে বীজ তার অভ্যন্তরে প্রোথিত করল তার অধস্তন তৃতীয় এবং চতুর্থ পুরুষে সে পল্লবিত হয়ে অনেক সমস্যা, আশা, আকাঙ্ক্ষার এবং দুঃখের জন্ম দেবে।''

এই লক্ষণ সোরেনই পীতেম বাজিকরকে সেই চরম দ্বান্দ্বিক প্রশ্নটি করে—

> 'তোমাদের কি জাত, সুরদার'
> —'আমরা বাজিকর জাত'

তবে তখনও চৌধুরি সাহেব 'তুমরা হিঁদু না মোছলমান' এ প্রশ্ন তোলেনি। হিন্দুস্থান—পাকিস্তান হয়নি। তখনও লালকুঠির ম্যানেজার মহিমবাবু 'হোঁই বাপু, তোরা গরুও খাস। শুয়ারও খাস, ই কেমকা জাত রে বাপো;' বলে আঁতকে ওঠেনি।

পথে প্রান্তরে ঘোরা বাজিকরদের সরদার পীতেম-এর জীবনকাহিনিতে আসে সালমা প্রসঙ্গ। সালমার অদ্ভুত জীবনও বাজিকর জীবনের আর একটি ধারা। পীতেম-সালমা প্রসঙ্গে আসে তাদের আর এক পৌরাণিক স্মৃতি। হাজার হাজার বছর আগে যখন তারা কোনো এক বিশাল নদীর ধারে স্থায়ী বসবাস করত তখন বাজিকর যুবক ও যুবতি পুরা ও পালির বিবাহে ছিল দেবতার অভিশাপ—

> ''তোমরা এক বৃক্ষের ফল দুবার খেতে পারবে না এক জলাশয়ের জল দুবার পান করতে পারবে না, এক আচ্ছাদনের নীচে একাধিক রাত্রি বসত করতে পারবে না''

—সেই থেকে তারা পথে প্রান্তে ঘুরছে। তখন থেকে তারা দেবতা থেকে বঞ্চিত। গৃহস্থের গৃহের নিকট পর্যন্ত যায় কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। 'সুতরাং বাজিকর এক ভিন্ন জীবন এক অস্থির চলমান জীবনকে আশ্রয় করে আছে। সে নিজেকে ভুলিয়েছে নাচ-গান এবং চিন্তাহীন সরল জীবনযাত্রায়। সে শিখেছে মানুষকে ঠকাতে এবং তা নিয়েই তার অহংকার। সে গ্রহণ করেছে বিচিত্র ভিক্ষাবৃত্তি যার জন্য কোনও সংকোচ তার নেই। তবুও কোনও বাজিকর স্থিতু হতে পারে না, কেন তারা পথে পথে ঘোরে, কেন ঘর বাঁধে না এসব প্রশ্ন আজকাল পীতেম বাজিকরকে

ভাবায়। তবে এও সে বোঝে যে গেরস্থ হওয়া মানে বাঁধা জানোয়ার হওয়া। আর বাঁধা জানোয়ারকে দোহন করা অনেক সহজ। গত দশবছর ধরে পীতেম দেখেছিল দোহকের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে। বাজারে হাটে বাজিকরের সামান্য পণ্য বিক্রির সময়ও ভাগীদার এসে হাজির হয়। নিতান্ত খেলা দেখিয়ে, ভিক্ষাবৃত্তি করে বাজিকর যা উপার্জন করে যা একান্ত তাদের নিজস্ব। সেখানেও যে মাটি ফুঁড়ে দালাল এসে জোটে। ভাগ দিতে হয় দারোগা, পুলিশকে, ভাগ দিতে হয় স্থানীয় বদমাশদের। সব মিলিয়ে পীতেমের কাছে জীবনযাত্রার মানেটা কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়—

> ''অতিপরিচিত সমাজ, নিয়মশৃঙ্খলা, লোভ, পাপ, ক্ষুধা, ঘাম, রক্ত, ব্যক্তি, গোষ্ঠী কোন নিয়মে চলে, কেনই বা চলে! এসব বাজিকর বুঝতে চায় না, বোঝার দরকারও বোধ করে না। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো পরিহাসের মতো যে বিষয় তা হল, বাজিকরের অস্তিত্ব নির্ভর করে যেসব মানুষের উপর তারা বাজিকর নয়। তারা যূধবদ্ধ, শ্রেণিবদ্ধ, আপন-আপন অঙ্গীকারে বদ্ধ মনুষ্যকূল''

—এসব সত্ত্বেও বাজিকর ভাবে 'কেবলমাত্র যাযাবরই জীবনকে সঠিক জানে বা জীবনকে পুরোপুরি ভোগ করে'। পীতেম বাজিকরের স্থিতু হবার স্বপ্নের প্রভাব সমস্ত যাযাবরী চাঞ্চল্যেও একসময় ক্লান্তি আনে। তখন তারা নতুন রাস্তায় পা বাড়ায়। কিন্তু সব রাস্তাই প্রাচীন এবং প্রথম চমক কেটে গেলে যাযাবর বোঝে সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সে। তাই সে স্থিতু হতে চায়। বাজিকর খবর পায় রাজমহল পাহাড়ের গায়ে ঈশ্বরপুরের জমিদারির কিছু খাস জমি পাট্টা বিলি করতে শুরু করেছে নায়েব শ্যামলাল। খোঁজ পেয়ে পীতেম যায়। আগের মতো এবার আর তাদের বাজিকর ঘুরে বেড়ানো জাত বলে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। নগদ টাকার বিনিময়ে তারা পাঁচ বিঘা জমির পত্তনি পায় কিন্তু আবারও তারা ঠকে। সালমা দয়ারামের কাছ থেকে জানতে পারে সে সব ভুয়া পাট্টা।

চারিদিকে শুরু হয় সাঁওতাল বিদ্রোহ, বাজিকর যুবক বালি দেখেছিল শৃঙ্খলিত লক্ষণ সোরেনকে। এই সময়েই বাজিকর যুবতি পেমা আর দারোগাপুত্র আনন্দের প্রণয় জটিল হয়ে ওঠে। সে কারণেই এই স্থানের ছাউনি ও বাজিকরদের তুলতে হয়। আবার এক প্রাকৃতিক পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অন্যস্থানে বাজিকরের জীবন শুরু হয়। সাঁওতালদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য লোকজন সংগ্রহ চলছে। বরোজ সাহেবের তত্ত্বাবধানে জানকীরাম আসে বাজিকরের কাছে। যেমন দারোগা পুত্রের বিলাসের জন্য বাজিকর পীতেমকে দিতে হয় তার পুত্র ধন্দুর প্রিয় ঘোড়াটি, তেমনি দারোগা পুত্র আনন্দের বিনোদনের, ভোগের শিকার হয় বাজিকর যুবতি পীতেমের কন্যা পেমা, একইভাবে ইংরাজের প্রয়োজনে ধন্দু, বালি, পরতাপ, পিয়ারবক্স এবং জিল্লু এই পাঁচ বাজিকর যুবককে যেতে হয় সাঁওতালদের বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে। যেতে তারা বাধ্য, তা না হলে

আবার তাদের বসতি তুলতে হবে। পীতেম স্থিতি চেয়েছিল। রাজমহলে দীর্ঘদিনের উপস্থিতিতে সে পেয়েছিল একটা ক্ষতিকর স্থিতি। সেজন্য তাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। কন্যা পেমা পুত্র ধন্দুকে হারাতে হয়েছিল। দল শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। পথে ঘুরে ঘুরে দল ক্লান্ত। যখন তারা রাস্তা দিয়ে চলে যায় দেখে মনে হয় হাজার বছরের ধূসরতা তাদের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে, তাদের দেহে। বাজিকর রাজমহল ছেড়ে আবার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে শুরু করল, পুরুলিয়া, কুচবিহার, কিশানগঞ্জ, দিনরাজপুর, রংপুর, মালদা। যখনই তারা বিপদে পড়ে, রহুচণ্ডালের হাড়ে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে পথে নামে। পীতেম দেখে তার পিতা দনুকে। দনু বলে,

> ''ওই দেখ রহু তোমায় দেখে। রহু সব বাজিকরকে দেখে, রহু দেখে কবে বাজিকরের পথ চলা শেষ হয়। কারণ রহু তার হাড় দিয়েছিল বাজিকরকে, যেন সে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে।''

এই তাদের বিশ্বাস।

রহুচণ্ডাল আসলে বাজিকরদের পৌরাণিক চরিত্র। বাজিকর গোষ্ঠীর আদিম পূর্বপুরুষ। যে-ভূখণ্ডে রহু তার দলবল নিয়ে অবস্থান করত সেখানে জীবন ছিল নদীর মতো আর নদীতে ছিল অফুরন্ত স্রোত। দনু বলে—

> ''পীতেম তেমন নদী কেউ দেখেনি যে নদীতে তোমার পিতৃপুরুষ বাস করত। তেমন জাত আর কোথাও নেই যে জাতে তোমার জন্ম। আর সেই জাতের মানুষ যে গান গাইত, যে সম্পদ উৎপাদন করত, যে জীবন যাপন করত, তার তুল্য আর কিছু নেই... রহু তার মানুষ নিয়ে সেই ভূখণ্ডে থাকত, যেখানে জীবন ছিল নদীর মতো নদীতে ছিল অফুরন্ত স্রোত বনে অসংখ্য শিকারের পশু এবং মাঠে অজস্র শস্য। মানুষ ছিল স্বাধীন সুখী। তারপর সেই মানুষটা এল... সে এসে প্রথমেই মাঠ থেকে রহুর সেরা ঘোড়াটি ধরে নিল। সে কিছু স্বতন্ত্র রহুর মানুষের সঙ্গে তার মিল নেই।''

এই অপরিচিত মানুষটি বলল, পরিশ্রম নয়—'আমি অর্জন করি আমার এ খর্গের সাহায্যে' রহুর দলের যুবকেরা তাকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল কিন্তু রহু বাধা দেয়। কেননা সে এই অদ্ভুত মানুষটাকে বুঝতে চেষ্টা করেছিল। সে অমঙ্গল আশঙ্কা করেছিল। আবার সেই ব্যক্তি ফিরে আসে অনেক লোকলস্কর নিয়ে। এবার রহু তার পথ আটকাল। রহু তাদের পবিত্র নদীর তীরে যেতে দিতে চায় না। কারণ তা তারা অপবিত্র করবে কিন্তু সেই নদীর তীরেই তারা তাদের দেবতার মূর্তি নির্মাণ করেছিল, তারপর ফিরে গিয়েছিল। ফেরার পথে তারা রহুর জনপদকে যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করেছিল। শস্য নষ্ট করেছিল, রমণীদের ধর্ষণ করেছিল এবং বাধাদানকারীদের হত্যা করেছিল। এই মদমত্ত ও স্বেচ্ছাচারী মানুষগুলো তৃতীয়বার আরও বলশালী হয়ে ফিরে আসে।

এবার সেই অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ছিল তার পুরোহিতগণ। তারা সেই মন্দিরে দেবতাস্থাপন করল এবং তাদের বিচিত্র রীতিপদ্ধতির অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করল। তারা তৃষ্ণার্ত রহুর স্বজাতিদের নদীর জল ব্যবহারে নিষোধাজ্ঞা জারি করল। রহু তার প্রতিবাদ করল এবং অবশেষে আবিষ্কার করল বহিরাগতদের যাবতীয় ভ্রষ্টাচার তার নিজের গোষ্ঠীতে অনুপ্রবেশ করেছে। সে তখন গোষ্ঠীর সকলকে ডেকে বলল—

> ''এরা আমাদের অন্ত্যজ করেছে আমাদের পবিত্র নদীর স্পর্শ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে, আমাদের মধ্যে ভ্রষ্টাচারকে প্রবেশ করিয়েছে... এই অসম্মান এবং অধঃপতন থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের প্রাচীন অধিকার এবং সমৃদ্ধিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার জন্য আমাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। অনেক রক্ত দিতে হবে আকাশের দেবতাকে।''

এরপর রহুর গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল আত্মকলহ শুরু হল। কারণ তখন তারা ভ্রষ্টাচারে নিমগ্ন। তাই রক্তদানের মতো পবিত্র কর্মে আর তারা একমত হতে পারে না। রহু তাদের বলে যারা তাকে অনুসরণ করবে না তারা চিরকাল বহিরাগতদের কাছে অন্ত্যজ এবং দাস হয়ে থাকবে। আর যারা তাকে অনুসরণ করবে তারা অবশ্যই একদিন তাদের পুরানো গৌরব ফিরে পাবে। গোষ্ঠীর এক অংশ রহুকে অনুসরণ করল। অন্যেরা উপহাস করতে লাগল, রহু এগিয়ে চলে, নদীর কাছে এসে রহু তার স্বজনদের বলে, আমি চিরকাল তোমাদের সহায় থাকব। এখন এসো এই নদীকে আমরা পুনরায় অধিকার করি। তারপর সেই বিদেশি লোকটি প্রবল খড়গাঘাত করল রহুর বক্ষদেশে। রহুর বক্ষদেশের সেই ক্ষত থেকে জলস্তম্ভের মতো উচ্ছ্রিত হতে লাগল রক্ত এবং সেই রক্তের প্রবল বন্যায় নদীর জল উঠল কেঁপে। সেই রক্তের নদী বহিরাগতদের নগরী। দলত্যাগীদের ভূখণ্ড সব গ্রাস করে ধ্বংস করল। কেবল রহুর অনুগামীরা তার দেহের অস্থির কয়খানি আশ্রয় করে নতুন পথে পা বাড়াল। এখান থেকেই মিথের জন্ম। বাজিকরের বিশ্বাস রহু তাদের সঙ্গে থাকেন। তাদের রক্ষা করেন, নতুন ভূখণ্ডে তাদের সুস্থিতি না করিয়ে তার তো মুক্তি নেই। তবে রহু ঈশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান নয়। সে এক প্রাচীন দলপতি, তার ওপরে দেবত্ব আরোপ করা যায় না। কারণ লেখক বলেছেন,

> ''সমস্যা ছিল পীতেমের, সমস্যা ছিল জামিরের, সমস্যা লুবিনির, শারিবার, সমস্যা কিছু বাজিকরের, রহু ঈশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান নয়। সে এক প্রাচীন দলপতি, সে এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর নীতি নির্ধারণ করত তার জীবদ্দশায়। কিন্তু লুবিনি কিংবা কোনো বাজিকর তাকে ভগবান, আল্লা ইত্যাদির সমগোত্রীয় ভাবতে পারে না। এই অমোঘ শক্তিধরদের যে পরিচয় বৃহত্তর সমাজের কাছ থেকে সে পায়, রহুকে তার সমগোত্রীয় ভাবতে তার শুধু ভয় নয়, অনিচ্ছাও বটে। কাজেই তার বোধের মধ্যে রহু বেঁচে থাকে এক

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দলপতির মতো। তার উপরে সে দেবত্ব আরোপ করতে পারে না কারণ দেবত্ব আরোপ করতে পারার মতো সামাজিক স্থিতি তার নেই।”

এভাবেই রহু চণ্ডালের মিথের আবহে উপন্যাসটি পল্লবিত হয়েছে এক যাযাবর জনগোষ্ঠীর কৃষি-সভ্যতায় উত্তরণের, সংগ্রামের ইতিহাস হয়ে। আমরা দেখি রহুর কাহিনির পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে বারবার বাজিকর জীবনে। সভ্য মানুষ তাদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে সমানে, তাদের স্থিতু হবার বাসনাকে ছিঁড়ে ফেলে তাদের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীতে ভাগ বসিয়েছে, তাদের ব্যবহার করেছে। বাজিকর যখন বাধা দিয়েছে বা বিপরীত আচরণ করেছে তখন তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের বিতাড়িত করা হয়, আর বাজিকর রমণীকে যথেচ্ছ ভোগ করা হয়, প্রয়োজনে ধর্ষণও। এভাবেই অভিশপ্ত তাদের কাহিনি এগিয়ে চলে পীতেম থেকে শারিবা পর্যন্ত।

রাজমহল ছেড়ে নতুন করে বাজিকর তাদের অস্থায়ী গেরস্থালি শুরু করে মালদা শহরে মহানন্দা নদীর তীরে। পনেরো বছর মালদা শহরকে কেন্দ্র করে বাজিকর থাকে। গঙ্গার ওপারের উপদ্রব যদিও এখানে নেই, তবে তাতে স্বস্তিও পায় না। তাই এই সহায়হীন মানুষগুলো এখন আরও ধূর্ত ও ঠগ হয়ে যায়। ঢোলক বাজিয়ে ঘোরে আর সেই সঙ্গে সমানে চলে চুরি ও বেশ্যাবৃত্তি, হাত দেখা ও ভবিষ্যৎবাণী। কখনও তারা ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে চলে যায় রাজশাহি, রংপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, কাটিহার, বারাউন পর্যন্ত। কিন্তু আর পশ্চিমে তারা যায় না। কারণ পশ্চিমের ভীতি এখনও তাদের মারাত্মক। পশ্চিমে একসময় ধ্বংস এসেছিল, জলস্তম্ভ হয়েছিল, রহুকে ভাসিয়ে নিয়েছিল। আর পশ্চিমে গোরখপুরে ভূমিকম্পে বিশাল ভূ-খণ্ড মাটিতে বসে গিয়েছিল। মালদা শহর থেকে উত্তর-পূর্ব কোণে পঁচিশ-তিরিশ মাইল তফাতে মহানন্দা ও টাঙ্গনের সংযোগে যে-বদ্বীপ তৈরি হয়েছে সেই আদিম ভূখণ্ডে কিছু জমি পেল বাজিকর। সালমার প্রতি জমিদার বদিউলের দুর্বলতার মধ্য দিয়ে বাজিকর পেয়ে যায় কিছু স্থায়ী ভূখণ্ড। কিন্তু বাজিকর ভাবে, কে যাবে এই অজগর জঙ্গলে নদীনালার গোলকধাঁধায় গাছ কাটতে। কিন্তু ভাগ্যহত অসহায় মানুষের তো অভাব নেই জগতে, লক্ষ সাঁওতাল তখন ছিন্নমূল হয়েছে, তারা তখন রাজশাহি, দিনাজপুরে প্রবেশ করে। ওদের দেখাদেখি আসে মুণ্ডা, ওঁরাও, ভুঁইয়া, তুরি, মাল, মাহালি, লোহার, কোল, কামার—এইসব খেটে-খাওয়া মানুষের দল। বাজিকররা জমি দেখে হতাশ হলেও সাঁওতালরা বলে কী এমন খারাপ জমি। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ঘর সাঁওতাল সেখানে বসত স্থাপন করে। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশত বাজিকর তো জানে না কীভাবে ফসল ফলাতে হবে এই আদিম অনাবাদী ভূমিতে। জানে না বছরের কোন সময় বীজবপন করতে হবে। তারা যে-জমি পেয়েছে প্রথম তিন বছর তার কোনও খাজনা নেই, কিন্তু তৃতীয় বছর থেকে খাজনা দিতে হবে। পরতাপ ভাবে আস্তে আস্তে বাজিকর শিখে নেবে সব কাজ, কারণ পীতেমের গৃহস্থ

হবার স্বপ্ন এখন পরতাপের ভেতর প্রোথিত হয়েছে। আর তার পরবর্তী প্রজন্ম ধন্দুর ছেলে জামির, সে সবে জোয়ান হয়ে উঠেছে। এ কাজে তারও উৎসাহ প্রচুর। মালদা আর জামিলাবাদে স্থিতু হয়ে এভাবেই বাজিকররা তাদের দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে।

জামিলাবাদে সাঁওতালদের নতুন পত্তন করা এই গ্রামের নাম নমনকুড়ি, যেখানে পরতাপ জমি চাষ করে স্থায়ী গৃহস্থ হওয়ার স্বাদ পেয়েছিল। জামিলাবাদে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস, হিন্দুরা মূলত ছিল গোপ সম্প্রদায়ের লোক যাদের জীবিকা ছিল পশুপালন। আঠারো শতকের শেষদিকে ও উনিশ শতকের গোড়ায় দেশে ঘনঘন খাদ্য-সঙ্কটে সরাসরি সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্য কেনার ব্যবস্থায় কৃষিজাত পণ্যের দাম দ্রুত বাড়তে শুরু করে। অকৃষিজীবী মানুষও এ কারণে বেশি বেশি করে কৃষিকর্মের দিকে মন দেয়। কৃষিকর্মের মূল বিষয় ধৈর্য আর অপেক্ষা যা বাজিকরদের ছিল না তবুও এর মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল পরতাপ। সে সাঁওতালদের সঙ্গে সমান তালে জমি খালাস করেছিল আর জমিতে শস্য উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করেছিল। তারপর ভুঁইঞা পদাধিকারী কিছু ব্রাহ্মণ বিহার থেকে এসে জামিলাবাদের জমিদারির এই অংশ কিনে নেয়। বিভিন্ন ছুতোনাতায় পুরোনা পত্তনি উচ্ছেদ করে অনেক জমি খাসে আনতে শুরু করে। ফলে নমনকুড়িতে যে-সকল জমিতে ভালো ফসল হচ্ছিল যা সাঁওতাল ও বাজিকররা নামেমাত্র খাজনা দিয়ে ভোগ করছিল তা তারা দখল করে নেয়। বাজিকররা যেহেতু জমিজমা সংক্রান্ত আইন কানুন কিছুই বোঝে না তাই তাদের উচ্ছেদ করা খুবই সহজ। এর পরের বছর সরকারি উদ্যোগে যখন আত্রাই-এর মুখের বাঁধ সরে যায়, নমনকুড়ির নিচু জায়গা ডুবে যায় প্রবল জলস্রোতে। বাজিকররা জলকে ভয় পায়, তারা সাঁওতালদের মতো সাহসী চিন্তাভাবনা করতে পারে না, তাই তারা জল নামার অপেক্ষা না করে আবার সেই তাদের কাঙ্ক্ষিত কাল্পনিক পূবের দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।—

> ‘‘লুবিনি সেই পূর্বের দেশের কথা শারিবাকে বলে যে পূবের দেশের কথা দনু পীতেমকে বলেছিল। পীতেম বলেছিল পরতাপ, জমির আর লুবিনিকে, জামির বলেছে রূপাকে, আর এখন এই সমুদয় পূবের দেশের বৃত্তান্ত লুবিনি শোনায় শারিবাকে, কিন্তু কোথায় যে সেই স্থির দেশটি, যেখানে আছে বাজিকরের স্থিতি স্থায়িত্ব, সে কথা কেউই জানে না, প্রতিবারই মনে হয়েছে এই বুঝি এই দেশ, প্রতিবারই কোন না কোন আঘাত, সে আঘাত মানুষের সৃষ্ট হোক কিংবা প্রকৃতির সৃষ্ট হোক বাজিকরকে দিশেহারা করেছে।’’

এরপর মাসখানেক এদিক সেদিক ঘোরার পর মানুষগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অদ্ভুত এক তাড়নায় তখন জামির নিত্য নতুন দেশ খুঁজে চলেছে। এমন একটি স্থান খুঁজছে যেখানে নমনকুড়ির মতো অজস্র ফসল সে ফলাতে পারবে। অন্য জীবনের স্বাদ বাজিকর পেয়েছে। তাই সে আর আগের

ভিখমাঙ্গা কাজে ফিরতে চায় না। এখন জামির স্থিতি চায়, নিজের দলের জন্য একটা পরিচয় চায়।

এখানে সেখানে ঘুরে ফিরে জামির শেষ পর্যন্ত রাজশাহি শহরের বাইরে পদ্মানদীর ধারে নামাল তাদের মোটঘাট। আর সুখ-স্বপ্নের মতো তাদের স্মৃতিতে থেকে গেল নমনকুড়ি; সেই ধান চাল গোরু-মোষের গৃহস্থালি। এখানে এসে রমজানের সঙ্গে যোগাযোগ হয় জামিরের, শহরের উপকণ্ঠে রমজানের গ্রাম। জমি থেকে বিভিন্ন কারণে উৎখাত হওয়া কয়েকঘর মানুষ যাদের জীবিকা গঞ্জের হাটে কুলিগিরি। বাজিকর দেখে এখানেও দুই ধর্মের মানুষ আছে হিন্দু ও মুসলমান। এর সাথে ওর কোনও মিল নেই কিন্তু। আর এই দু-জাতের কারও সাথে বাজিকরের কোনো মিল নেই। রমজানের সঙ্গে জামির আবার জমির টানে চাষের কাজে লাগে। নদীর চরে তরমুজের চাষ করে সে, আর বাজিকরের অপটু হাতে অনেক কষ্টে ফসল ফলায়। কিন্তু সেই কষ্টের ফসলে হাত বসায় লুটেরা। প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুনের দায়ে জামিরের জেল হয়। নদীর পাড় থেকে বাজিকর বসতি উঠে এল শহরের কাছে। বৃদ্ধ বালি আর বাজিকর দলের কিছু লোক এই প্রথম পুলিশ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তাদের কিছু দাবির কথা বলে। তারা এখানে আরও কিছুদিন থাকার আর্জি জানায়। তারপর ছ-সাত বছর জেল খেটে ফিরে আসে জামির। সে এখন বৃদ্ধ। আরও বিশ বছর সে বেঁচে থাকে বাজিকরদের দুর্গতির সমস্ত দায় বহন করবার জন্য। আবার সে খোঁজ করে দেখে বাজিকরদের বসত করবার মতো জায়গা দুনিয়ায় আছে কিনা। কিন্তু কোথায় সেই স্থান যা বাজিকরকে ধারণ করতে পারে!

এরপর তারা উত্তর পাতালু নদীর তীরে পাঁচবিবি নামে একটা বর্ধিষ্ণু গ্রামে নতুন বসত পত্তনি করে। সেখানে হিন্দু ও মুসলমান দুই জমিদারেরই কুঠিবাড়ি আছে। তারা বেশ কয়েক বছর ধরে জমিদারের কুঠিবাড়ির খাস জমিগুলি উদ্ধারের কাজ করে। তখন কোথায় নাকি যুদ্ধ হচ্ছিল তাতে অনেক গাছের দরকার। এই গাছ কেটে জমি সাফ করতে শুরু করে বাজিকর। বেশ কয়েক বছর মহিমবাবু ও লালমিয়ার সেবা করার পর বাজিকরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তোমরা হিন্দু না মুসলমান? অথচ দীর্ঘ একশো বছর এ প্রশ্ন জরুরি ছিল না, যা এখন মহিমবাবু কিংবা লালমিয়ার কাছে জরুরি ঠেকেছিল। পাঁচবিবিতে বসত করার এক পুরুষ পরে বাজিকর জামির তার দলকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিল যে তারা আর কোনোদিন ভিখমাঙ্গার কাজ করবে না। উপন্যাস যখন শুরু হয় তখন বাজিকর সম্প্রদায় এই পাঁচবিবিতে অবস্থান করছিল। এখানেই দনুর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষকে তার নানি এসব বৃত্তান্ত শোনায়। আর তিনবার ঘরভাঙার স্মৃতি মনে করে অনেক বেশি একাগ্রতায় নিবিষ্ট হয়ে শারিবা এইসব কথা শোনে,—

''গোরখপুর থিকা, ডেহরিঘাটে, সিথায় ক-বছর তা বাদে সিওথান, সিথায় ক-বছর, তা

> বাদে দানাপুর, পাটনা, মুঙ্গের, কত দেশে তোর নানার নানা বসত করার চেষ্টা করল, হল না। তারপর এই পূবের দেশ। তা এখানেও কি স্বস্তি আছে? মানুষ চায়, বাউদিয়া বাউদিয়াই থাকুক, বাজিকর বাজিকরই থাকুক, তার আবার ঘর-গেরস্থালি কি? রাজমহল, মালদা, নমনকুড়ি, রাজশাহি, আমুনাড়া, পাঁচবিবি। সব শেষে এই পাঁচবিবি।"

শারিবার নানা জামির বলত—'মজুর খেটে খাব ভিখ মাঙব না, লোক ঠকাবো না, বে-ইজ্জতের কাজ করব না। আমার বালবাচ্চা হবে ইমানদার।' সে চাইত সম্মানী গৃহস্থ হতে, কিন্তু তা আর হল না। বাজিকর পাটখেত নিড়াতে জানে, তবে হাল মই দিতে জানে না, তাই তাকে মার খেতে হয়, চুরির দায়ে তার জেল হয়। গ্রামে মড়ক দেখা দিলে দোষ হয় বাজিকরের, তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তবুও জামির সান্ত্বনা দেয় মার খেয়েই শিখতে হবে। এভাবে সে পাঁচবিবি নদীর চর আঁকড়ে পড়ে থাকে, চায় চাষি গেরস্থ হতে। 'নিজের ভঁইস থাকবে, ভুঁই থাকবে।' কারণ ভিখমাঙাকে সে ঘৃণা করে। কিন্তু পাঁচবার হাতি ঘরদোর ভাঙার পরে তার সে ইচ্ছা আর আগের মতো থাকে না। আবার বাজিকরকে ঝোলা ঘাড়ে নিয়ে ভিখ মাঙতে বের হতে হয়। তারা বোঝে বেঁচে থাকাটাই প্রথম লড়াই। এভাবেই বাজিকরের জীবন চলে গড়িয়ে।

যতদিন জামির বাজিকর বেঁচেছিল, বাজিকরের চিন্তা ছিল না। কারণ জামিরের সঙ্গে চৌধুরীবাবু ও লালমিয়ার মৌখিক চুক্তি হয়েছিল যে, জঙ্গল খালাস হলে জমিগুলো বাজিকরদের আধি দিতে হবে। তখনও তেভাগা হয়নি। এরপর ইংরেজদের এদেশ ছেড়ে যাবার সময় ঘনিয়ে আসে। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান ভাগাভাগি হয়ে যায়। তেভাগার লড়াইয়ে শামিল হয় চাষিরা, আধির উপর দখল কায়েম রাখার জন্য আধিয়াররা সংঘবদ্ধ হয়। এই লড়াইয়ে অনেক চাষি মরে আবার অনেক জোতদারও মারা যায়। তেভাগা আন্দোলন চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের এক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন। অন্যদিকে সত্তর দশকের আন্দোলনে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাই কাহিনির বিস্তার স্বতঃস্ফূর্ত। আধিয়ার দাবিতে বাজিকর দু-বছর সেই নতুন জমিতে ফসল ফলানোর চেষ্টা করে। আস্তে আস্তে তারা চাষের কাজও পুরোপুরি শিখে নিল। জীবনকে নতুন স্বাদে নতুন রঙে উপভোগ করতে শিখল তারা—

> ''যাবতীয় অনাস্বাদিত সুখের খোলা দরজার সামনে তারা যেন এসে দাঁড়িয়েছে। এইবারে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি মিলে গেছে। গৃহস্থের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, সামাজিকতার অধিকার যেন আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে। যাযাবরের তাঁবু ছিঁড়ে ফেলে শক্ত, খুঁটোর ঘর বাঁধা। তারপর জীবন বয়ে যাবে স্বাভাবিক স্রোতের মতো। অনির্দিষ্টের মধ্যে আর ঘুরতে হবে না। জমি হচ্ছে স্থিতি—দৈহিক মানসিক ও সামাজিক।"

কিন্তু তখনই লালমিয়ারা প্রশ্ন তোলে তাদের ধর্ম কী ? 'নাম তোর ইয়াসিন, আর তুমু মুছলমান লও?' বাজিকর যখন ভাবে তার পায়ের নিচে আর চোরাবালি নেই, সেই মাটি শক্ত হয়েছে, তখনই শক্ত মাটিতে ধস্ নামে। লালমিয়া, মহিমবাবুরা ভাবে যার ধর্ম নেই তার সঙ্গে আবার ন্যায় নীতির সম্পর্ক কী ? যার সমাজ নেই তার সঙ্গে সামাজিক চুক্তিও হয় না নিশ্চয়। তাই ইয়াসিন, রূপার জমি আবার বেহাত হয়ে যায়। লুবিনি, জামিরের লড়াই শেষ হয়ে রূপা শারিবার লড়াই শুরু হয়। জোতদার দিগিন মণ্ডল বাজিকরদের জমি কিনে নেই ফসলভর্তি জমি বেদখল হতে দেখে, বাজিকরের যাযাবর রক্ত আকস্মিক ক্রোধে ঝলসে ওঠে। রূপা খুন করে ফেরার হয়, ভয়ার্ত বাজিকর চারপাশে আঁধার দেখে—

> ''পালায় সে ক্রমাগত পালায়, পিছনে পড়ে থাকে দুই পুরুষের অর্জিত অধিকার, প্রিয়জন, আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত ঘর-গেরস্থালির পরিকল্পনা। বাজিকর রমণীরা বয়স নির্বিশেষে ধর্ষিতা হয়। ইয়াসিনের মেয়ে পলবি নিখোঁজ হয়। তারপর এই ছিন্নমূল মানুষগুলোকে তাড়িয়ে অনেকদূর পার করে দেয় মহিমবাবু লালমিয়া দিগিন মণ্ডলের লোকেরা। এসব উপভোগ করার মতো দৃশ্য তখন হামেশাই হতো। বাচ্চা-কাচ্চা-পোঁটালা-পুঁটলি নিয়ে মানুষ ছুটছে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। পিছনে তাড়া করে যাচ্ছে আরেক দল ক্ষিপ্ত মানুষ, ছুঁড়ছে ঢিল।''

আবার বাজিকরের সেই পূর্বের দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা। পূর্বে চল্লিশ মাইল সরে এসে পাতালু নদীর ধারে মোহর হাটখোলায় বাজিকর পুনরায় তাদের জীবনের বোঝা নামায়, তাদের মোটঘাট ফেলে। এখানে খোলা আকাশের নিচে ছ-মাস বসবাস করে জীবন হয়ে যায় আরো আদিম আরো নির্মম। এরপর ভারত পাকিস্তানের বিভাজনের ফলে পাঁচবিবি পড়ে পাকিস্তানে, মোহর ভারতে। শুরু হয় জমিবদল, জমি দখল, দেশের শাসন যত্র তত্র দেশের মানচিত্রে নানা রকম বদল ঘটাতে থাকে। তখন বাজিকরের পৃথিবীর রাস্তা সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। কারণ পঞ্চাশ বছর ধরে তাদের অভ্যাস বদলেছে। ইয়াসিনের নেতৃত্বে আবার বাজিকর স্থায়িত্ব খোঁজে, গৃহস্থ হবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। শোষক শক্তির আগমন ঘটে। আজুরা মণ্ডল-দিগিন মণ্ডল সে-শোষকের নাম। আরও ছ-মাস পরে বাজিকর গোষ্ঠী মোহর হাটখোলা ছেড়ে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তায় দু-পাশে নতুন করে কাদামাটির গৃহনির্মাণ করে। বাজিকরদের ব্যবহার করে আজুরা মণ্ডল। আজুরার জমি উদ্ধারের কাজে লাগে ওরা। বাজিকর যুবতিদের ভোগ করে আজুরা। বিনিময়ে বাজিকরের সহায় হয় সে। আজুরার জমি উদ্ধার হয় আর বাজিকর আবার স্বপ্ন দেখে খালাসি জমির আধি পাওয়ার। এভাবে বাজিকর টিকে থাকে—'মানুষ যেহেতু যে-কোনো জানোয়ারের থেকে অনেক বেশি পরিশ্রমী সে কারণেই বাজিকরেরা নিজেদের অস্তিত্ব রাখতে পারে।'

মোহর গ্রামে বাস করে চারঘর ব্রাহ্মণ, ছয়ঘর কায়েত, বাকি সদ্‌গোপ, মাহিষ্য, কৈবর্ত, এখানে বাজিকরের নতুন বসতি। ব্রাহ্মণদের মধ্যে তিনঘরই ভূস্বামী, এখানে সবচেয়ে শক্তিশালি ভায়রো। ভায়রো নিজে নমোশূদ্র, মোহর গ্রামে সে তার সমাজের 'বাইশ 'দিগরে'র মাথস'। ভায়রো শোষকের আর এক মুখ। ভায়রো যখন আবার সেই পুরোনো প্রশ্ন করে বাজিকরকে—'তুমরা হিন্দু না মুছলমান' তখন বাজিকর যুবক ইয়াসিন মুর্খের মতো আবেদন করে 'হামরাদের আপনাদের জাতে তুল্যে লেন'। ভায়রো প্রচুর হেসে জানায়—'হিন্দুধর্মে এমন হক কারো নাই। তুমু ব্রাহ্মণ কায়েৎ, মাহিষ্য, সদগোপ, নমোশদদু'র কেছুই হবা পারবা না। তুমু ইসব জাতের হয়া জন্মাবা পার, হবা পারবা না।' কিন্তু বাজিকর এখন যে-কোনও ধর্মকে আশ্রয় করে টিকে থাকতে চায়। যে করে হোক তাকে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে, স্থিতু হতে হবে। সে-সুযোগ বাজিকরের মেলে। হিন্দু ধর্মে না হলেও ইসলাম ধর্মে জাতপাতের বালাই নেই সে-রকম। বাদা-কিসমতের হাজি সাহেব বোঝায় ইয়াসিন, শারিবাকে। 'মুসলমান হলে ধর্ম পাবে, সমাজ পাবে, স্বজন পাবে। পড়ে পড়ে মার খাওয়ার কিবা অর্থ' কারণ তখন দেশ ভাগ হয়ে গেছে। ফলে সমষ্টিগত ভাবে মুসলমান এদেশে দুর্বল, এই শঙ্কা থেকেই হাজিসাহেবের প্রস্তাব বাজিকরদের। কিছু বাজিকর তার প্রস্তাব মেনে নেয়, কিছু মানে না কারণ তাদের অনেকেই হিন্দু আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বাজিকর তখন আর নিজের রক্তের সংমিশ্রণ চায় না। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের বিবাহের অধিকারও ওদের নেই। এই সংকটও বাজিকরকে ভেতরে ভেতরে জীর্ণ করে। বাজিকর যুবক ওমর আর নমশূদ্রদের মেয়ে মালতির প্রণয়ের ফলে বাজিকর পাড়া আবার তছনছ করা হয়। এরকম পরিস্থিতিতে ছয় ঘর বাদ দিয়ে সারা বাজিকর পাড়া হাজির প্রস্তাবকেই মেনে নেয়।

সব বাজিকর জানে 'রহুচণ্ডালের হাড়' কথাটাই ঐন্দ্রজালিক, বুজরকি। তবুও সব বাজিকরই এখনো রহুচণ্ডালের হাড়ের স্বপ্ন দেখে, মনে বিশ্বাসও করে তার সার্থক অস্তিত্ব সম্ভব। আজুরার জমিতে তখন বাজিকরের অবস্থান, আজুরা কামনা করে ইয়াসিনের মেয়ে পলবিকে। পলবি রাজি হয় না। আজুরা ঘোষণা করে 'রোডের পাশের জমি হামি বেইচে দিমো হয়, তুমাদের বসত ইবার তুলবা লাগে।' কিন্তু হাজির কাছ থেকে বাজিকর একথা জানতে পারে আজুরা চাইলেই তাদের বসত তুলে দিতে পারে না কারণ রোডের পাশের জমি 'বেবাক ভেস্ট', মানে সরকারের জমি। তাই আজুরা চাইলেই এখন আর তাদের উচ্ছেদ করতে পারবে না। হাজিসাহেব ও সোনামিয়ার প্রচেষ্টায় বাজিকর পেয়ে যায় স্থায়ী বাসস্থান। দাগ খতিয়ান দেখে ঘর প্রতি দশ টাকার বিনিময়ে প্রতি বাজিকর পরিবারের নামে একটা করে খাজনার রসিদ কেটে দেয় সোনা মিয়া। আর এই প্রথম বাজিকর কিছু নতুন শব্দ শোনে—দখল, উচ্ছেদ, বলবৎ, চেক, ফাকড়, পাট্টা। এসব জটিল বিষয় শোনা এবং এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করার সৌভাগ্য হয় বাজিকরের। এসবের বিনিময়ে বাজিকর ধর্মও পেয়ে যায়। কলমা পড়ে মুসলমান হয় বাজিকর। ইয়াসিন রূপাকে বলে—

> ''...হামরা কলমা পড়ব, মোছলমান হব। তা-বাদে একসাথে নামাজ করা হবে। একসাথে খানাপিনা হবে। হাজী সাহেব হামরাদের সাথ পাত পাড়বে, আর আর মোছলমান ইমানদার মানুষ হামরাদের সাথ পাত পাড়বে হামরা উঁচা হব, হামাদের জাত হবে।"

কিন্তু রূপার সংলাপে এর অন্তর্নিহিত সত্য রূপটিও আমরা দেখতে পাই,—''হামারাদের জাত হবে! কি হবে তা মাও বিষহরিই জানে। হামি হিন্দু হলাম। তুমু মোছলমান হলেন হিন্দু হামাক জাতে লেয় না। মোছলমান তুমায় জাতে লিবে সি বিশ্বাস হামার নাই।"

ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা পি: ডবলিউ. ডি-র হাতে এসে পাকা হয়, শারিবারা হানিফের প্রচেষ্টায় সেখানে কাজও পেয়ে যায়। তবে সব কিছু সহজে হয় না কারণ সাঁওতাল, ওঁরাও মজুরকে ঠিকাদার চেনে, তাদের দিয়ে কতটা কাজ হবে তা ঠিকাদার জানে কিন্তু বাজিকর এ জাতের নামই শোনেনি সে। তাই সহজে কাজ মেলে না বাজিকরের। হানিফও শারিবাদের জাত নিয়ে প্রশ্ন তোলে। 'তাজ্জব! এমন মানুষও এ দেশে আছে যার কোন জাত নাই।' তারপর সে উপলব্ধি করে—

> ''জাত থাকলে বেজাতও আছে। যার জাত নাই, বেজাতও নাই। তুমরাই ভালো আছেন গো। তুমাদের জাতও নাই বেজাতও নাই।"

বাজিকর মুসলমান হবে শুনে হানিফ উল্লসিত হয় না কারণ হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষকে এপার থেকে ওপারে, ওপার থেকে এপারে আসতে সে দেখেছে। সে মনে করে—'হিন্দু-মুসলমান বেবাক জাত যদি বাজিকরের মতন মনে করে, বেজাত হয়া যায়, তবে সিটাই ভালো হত'। হানিফ বিয়ে করে বাজিকরের মেয়ে পলবিকে। এ প্রস্তাব বাজিকর গোষ্ঠীকে গোরখপুরের শনিবারের ভূমিকম্পের মতো নাড়া দেয়। ছেষট্টি সালের দুর্ভিক্ষের অস্পষ্ট ছাপ এ অঞ্চলে দেখা যায়। 'বাজিকর রমণীদের আমাণির বাটি ফুল্লরার গর্তের মতোই অকরুণ।' এর পর বাজিকর বৃহত্তর রাজনীতির অংশ হয়ে যায়। কারণ বাজিকরদের সদলবলে মুসলমান হবার পরিকল্পনা ভায়রো বা আরও দশজন অর্থবান হিন্দু ভালো চোখে দেখে না। 'ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভারসাম্য আছে, বাজিকরদের সদলে মুসলমান হওয়ার ঘটনায় তা ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হবে।' খবরটা শহরে পৌঁছায় কিন্তু শহরের রাজনীতির তখন পটপরিবর্তন হয়েছে, সাতষট্টির নির্বাচনের ডামাডোল শুরু হয়েছে, সর্বত্র চরম অবস্থা, সর্বত্র বিশৃঙ্খলা। বিধানসভার আসনটি তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত। তাই রাজনৈতিক নেতারা কোনো সম্প্রদায়কেই চটাতে চায় না। একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক নেতা বা প্রশাসন বিষয়টিকে সমর্থন বা বিরোধিতা কিছুই করতে পারে না। সাতষট্টির ভোটের আগে, প্রশাসন যেমন চতুর নিরপেক্ষতা নেয়, তদন্ত রিপোর্টও তেমনি হয়। ভায়রো আজুরা মিলে

বাজিকরের মজুরের কাজ যেমন বন্ধ করে হাজিসাহেবের দলবল তেমনই উদারতা দেখায়। সমস্যাটা আর বাজিকরের থাকে না। সমস্যা এখন দুই সম্প্রদায়ের। এসবের ফলে ভায়রো দেখে ভিখমাঙ্গা বাজিকর এখন সোজা চোখে তাকিয়ে বিচার চায়। কারণ বাজিকরের পূর্বের সমস্যা আর নেই। তারা ধর্ম পেয়েছে, পেয়েছে স্থায়ী বাসস্থান। এবার বাজিকর ভোটাধিকার পায়। নতুন নতুন মানুষ বাজিকরদের ভোট সম্বন্ধে বোঝাতে আসে। ইয়াসিন আজুরাকে প্রশ্ন করে—'এলা কি বেপার? কাগজেৎ ছাপা দিল কি হবে?' আজুরা তাদের বোঝায়—'ওলা তুমাদের বুঝবা হোবে না বাপু। ওলা মেলাই কঠিন বেপার, রাজনীতি। যেথায় মারবা কলাম ওঠি মাইরে দিবেন বাস!' এই কঠিন ব্যাপারের কিছুই বাজিকর বোঝে না, তবু ভোট দেয়। বাজিকর মুসলমান হয় কিন্তু তবুও জাতে ওঠে না। হাজিসাহেব তাদের সাথে ওঠাবসা করে না। আরও বছর দুই পর ওরা বোঝে, ওরা যে বেজাত ছিল সেই বেজাতই থেকে গেছে। আধিজমি রেকর্ড হওয়ার কথা শোনা যায় চারপাশে, অনেক পরিবর্তন হয় কিন্তু এই মানুষগুলো একই রকম থেকে যায়; সেই একই নিরন্ন অসহায় হাঘরে সমাজবহির্ভূত বাজিকর।

উপন্যাসের শেষে শারিবা শহরে যায়। গ্যারেজে কাজ পায়, ভিখমাঙ্গা ছেড়ে প্রথমে যাযাবর বাজিকর গৃহস্থ কৃষক হয়, গ্রাম পায়, স্থায়ী বাসস্থান হয়। সেখান থেকে আবার বাজিকরের পরবর্তী প্রজন্ম শারিবা শহরে গিয়ে শ্রমিক হয়ে যায়। যদিও উপন্যাসের শেষে শারিবাকে গ্রামে ফিরতেই দেখা যায়। চাকরির দরখাস্তে ধর্মের জায়গায় বাজিকর লিখলে দরখাস্ত বাতিল হয়ে যায় কারণ বাজিকর কখনও কোনো স্বতন্ত্র ধর্ম হতে পারে না। শারিবা বোধ হয় স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। শারিবা না জানলেও লেখক অভিজিৎ সেন জানেন উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা-ব্যবস্থার জটিল কৌশলকে করায়ত্ত করে একটি স্বাধীন অখণ্ড গোষ্ঠী হিসাবে বাজিকরের প্রতিষ্ঠা পাওয়া ছিল অসম্ভব। বাজিকর-জীবনের সমস্ত ক্লান্তির ভারকে বহন করে শারিবা যেন বৃদ্ধ হয়ে গেছে, শারিবা এখন আলো-ছায়ায় সঞ্চরমান রহুর মতো বিষণ্ণ। সে ভাবে,—

> ''মুসলমানি ও হিন্দুয়ানিতে বিভক্ত বাজিকরেরা রহুকে বিস্মৃত হয়ে গেছে। একথা এবার সে গভীর ভাবে ভেবেছে। হতাশার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে আর রহু চণ্ডালের হাড় খুঁজবে না, একথা বোঝে শারিবা। অনেক চিন্তা করেও সে বুঝতে পারে না, এতে বাজিকরের ভালো কি খারাপ হল।" [৯]

তীব্র দ্বন্দ্বে ভোগে শারিবা আর শেষ পর্যন্ত অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাজিকরের রক্তের সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে, প্রতিষ্ঠা দিতে মালতীকে বিবাহ করে ওমরের সন্তানকে স্বীকৃতি দিতে চায় শারিবা। এভাবেই জাত-ধর্ম-দেশ-আত্মপরিচয় সমেত স্থিতি পায় যাযাবার বাজিকর। শেষ হয় একটি যুগ, একটি কাহিনির।

বলা যায়, যাযাবর জনগোষ্ঠীর কৃষিসভ্যতায় উত্তরণের, সংগ্রামের ইতিহাসে রূপান্তরের এক নাম 'রহু চণ্ডালের হাড়'। বাদিয়া বাজিকরের স্থিতির খোঁজে একশো বছরের ভূ-পরিক্রমণের ঐতিহাসিক আখ্যান। সম্পূর্ণ অন্য চেতনার এই কাহিনিকে বলা যায় উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্য ধারার একটি সার্থক নিদর্শন। এই উপন্যাসে আমরা পেলাম নিম্নবর্গের বয়ান বা 'সাব-অলটার্ন ডিসকোর্স'। শতকের পর শতক ধরে বাজিকর জীবনের গ্লানিকে অভিজিৎ সেন পরতাপ—জামির-লুবিনি-শারিবা পর্যন্ত নিয়ে এসে, আত্মপরিচয় হারিয়ে, অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা হারিয়ে একটি কৌশলী ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের উপনিবেশিত গুরুত্বহীন, ক্ষমতা ও মর্যাদাহীন সর্বোপরি প্রতিবাদহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছেন। লেখক খনন করেছেন হারানো এক ইতিহাসকে। সেই ইতিহাসের ভেতর সন্ধান করতে গিয়ে তুলে এনেছেন অনালোকিত আর এক বিশ্বকে। লেখক দেখেছেন একেবারে তল থেকে। এই তল থেকে দেখা আবহমান জন-জীবনের ভাষ্যকার হয়ে উঠেছেন অভিজিৎ সেন। সেই জনজীবনের প্রাণস্পন্দন মিথ, কিংবদন্তি লোককথার সংমিশ্রণে এ কাহিনি হয়ে উঠেছে জটিল বহুস্তরীয় প্রান্তিক বাস্তবতার ভিন্ন আখ্যান, ব্রাত্য বাজিকরের জীবন আখ্যান।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত : বাঘারু, কাদাখোয়া, মাদারির মা-র প্রবেশ

দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮) বাংলা উপন্যাসে প্রান্তিক বাস্তবতার আর এক সম্ভাবনাময় অসমাপ্ত পরিসর খুলে দিয়েছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি সচেতনভাবে নতুন মডেল-এর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। প্রথম দিকে 'বৃত্তান্ত' পরের দিকে 'প্রতিবেদন' জাতীয় কাহিনি এরই পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক সার্থক প্রচেষ্টা। যেমন 'মফসলী বৃত্তান্ত' 'আত্মীয় বৃত্তান্ত' 'সময়-অসময়ের বৃত্তান্ত'। সমালোচক বলেছেন—

> ''দেবেশের 'মফস্বলী বৃত্তান্ত'এর এপিসোডিক আখ্যানধর্ম উপন্যাসের পশ্চিমী প্রকরণ থেকে আমাদের দেশজ কাহিনীকথনের ঐতিহ্যভিত্তিক নবীন প্রকরণে উত্তরণের প্রয়াসকেই ধরিয়ে দেয়'' [১০]

উপন্যাসের গঠন সংক্রান্ত তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থে দেবেশ রায় বলেছেন 'ইউরোপীয় মডেলে আমাদের পরিত্রাণ নেই। কাহিনী বলার একটা নিজস্ব ধারা আমাদের ছিল পাঁচালি, কথকতা, কীর্তন আর কবিগান'। তিনি বললেন 'আমি চাইলে তো এখন আর মঙ্গলকাব্য লিখতে পারব না'। তবুও ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়াসেই যেন তিনি পেছন ফিরে তাকিয়েছেন, উপন্যাসকে আখ্যা দিয়েছেন বৃত্তান্ত রচনা।

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', প্রান্তিক জীবনের মহাকাব্য। প্রান্তিক বাস্তবতা এ বৃত্তান্তের নিহিত প্রাণ। 'আদিম আবহমান প্রাকৃতিক জীবনানুসন্ধান'— এ উপন্যাসের প্রাণময় ভিত্তিভূমি। উপন্যাসে দেখা যায় তিস্তা নদী আর তার সঙ্গে 'জীবনের এক প্রান্তিকতা থেকে অন্য প্রান্তিকতার দিকে ক্রমাগত ভেসে চলেছে উত্তরবঙ্গ সন্নিহিত জনগোষ্ঠীর আঞ্চলিক ইতিহাস ও ভূগোল'। বহমান এই কাহিনির ভেতর কান পাতলেই শুনতে পাওয়া যায় প্রান্তিক জনজীবনের সমবেত কণ্ঠস্বর। এই সমবেত কণ্ঠস্বরের ভেতর থেকেই বলা যায় প্রান্ত থেকে সুস্পষ্টভাবে, কয়েকটি কণ্ঠস্বরকে এবার আলাদা করে তুলে আনতেই হয়। কারণ সে-কণ্ঠস্বরগুলিকে আর কিছুতেই আমাদের সভ্য সমাজ অস্বীকার করে থাকতে পারছে না। না শোনার কপট ভানে ইন্দ্রিয় আর মনকে কিছুতেই অসাড় করে রাখার উপায় নেই আর। কারণ বোধহীন, চেতনাহীন বাঘারু, মাদারির মা, কাদাখোয়ার-র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর সভ্যতার কানের পর্দায় তীব্র আক্রোশে কঠিন আঘাত হানতে শুরু করে দিয়েছে। আপাত নির্বোধ সরল, শান্ত এই স্বরের তলায় প্রচ্ছন্ন আছে তাদের প্রবল বিরুদ্ধতা। সভ্যতা যেমন তাদের স্বীকার করেনি কোনোদিন, ফিরিয়ে দিয়েছে আদিম প্রাগৈতিহাসিক জীবনে ওরাও তেমনই বারবার সভ্যতাকে অস্বীকার করে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা দেওয়াটাই একটি গভীর সমস্যার সৃষ্টি করেছে যে-সমস্যা আমাদের এই সভ্যতার গভীরে প্রোথিত। সে-সমস্যাকেই একটি বৃত্তান্তে গ্রথিত করে দেবেশ রায় কুইনাইনের মতো পাঠককে গেলাতে চাইলেন। উপন্যাসের আকৃতি বিরাট। তিস্তা ব্যারেজের পাশে গাজোলডোবা গ্রামে গয়ানাথের জোত জমিতে এ কাহিনির সূচনা, তিস্তাপার ও আপলচাঁদ ত্যাগ করে বাঘারু ও মাদারির যাত্রায় তার সমাপ্তি। যদিও লেখক বলেছেন 'সমাপ্তি বলে কিছু নেই, শেষ না করলে এ বৃত্তান্ত চলতেই থাকবে'। ছয়টি পর্ব, দুশো উনিশটি পরিচ্ছেদ ও একটি পরিশিষ্টে বিন্যস্ত এ বৃত্তান্ত। এর মহাকাব্যিক বিন্যাসে পর্বগুলি বিভাজিত হয়েছে এভাবে—

১। আদিপর্ব—গয়ানাথের জোতজমি।

২। বনপর্ব—বাঘারু নির্বাসন।

৩। চরপর্ব—নিতাইদের বাস্তুত্যাগ ও সীমান্তবাহিনীর সীমান্ত ত্যাগ।

৪। বৃক্ষপর্ব—বাঘারুর প্রত্যাবর্তন।

৫। মিছিল পর্ব—উত্তর খণ্ডের স্বতন্ত্র রাজ্য দাবি।

৬। অন্ত্যপর্ব—মাদারির মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র।

পরিশিষ্ট—এই বৃত্তান্ত রচনার যুক্তি ও বৃত্তান্ত সমাপ্তির কারণ।

লেখক উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন তাদের, যাদের চরিত্র ছায়ার ছাপ হয়তো উপন্যাসে আছে, যারা এ উপন্যাস কোনোদিনও পড়বে না।—

''নন্দনপুর-বোয়ালমারীর নিতাই সরকার, ঘু ঘু ডাঙার আকুলুন্দিন, বানার হাটের যমুনা উরাওনি, গায়েকাঁটার রাবন চন্দ্র রায়।—এই বৃত্তান্ত তারা কোনোদিনই পড়বে না, কিন্তু তিস্তাপাড়ের জীবনের পর জীবন বাঁচবে।''

উপন্যাসের স্থানাঙ্ককে লেখক চিহ্নিত করেছেন একটি ম্যাপের সাহায্যে সচিত্র স্থানাঙ্কসহ উপন্যাসটি শুরু হয়েছে, তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের জন্য সেটলমেন্টের নতুন জরিপ-এর বর্ণনায় আর শেষ হয়েছে এই ব্যারেজের অকাল উদ্বোধনে। এর ভেতরেই এসেছে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক-রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। নদীর ভাঙন, উত্তরবঙ্গের বন্যা, মানুষের অনিশ্চিত জীবন। উত্তরাখণ্ডের দাবি বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিরোধ, এই সম্পর্কিত সরকারি-বেসরকারি-আমলাতান্ত্রিক-রাজনৈতিক কর্মসূচি। সমস্তটাকে কেন্দ্র করে, উচ্চবর্গ, মধ্যবর্গ, নিম্নবর্গ আর দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে অবস্থিত মানুষের জীবনাবর্ত। আর প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে প্রান্তিক প্রকৃতির সহাবস্থান। উপন্যাসের গোড়াতে সেটেলমেন্টের জমিজরিপ, হল্কা ক্যাম্পের সূত্র ধরে একটি অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ছাড়িয়ে যে দৈনন্দিন জনজীবন আর ঘটনার অভিঘাত, ঘটনাস্রোত হাটের পথ ধরে আদিপর্ব, বনপর্ব, চরপর্ব, বৃক্ষপর্ব মিছিলপর্ব পেরিয়ে পৌঁছে গেছে অন্তপর্বের অন্তিমে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনজীবন, রাজবংশী জাতি উপজাতির লোকইতিহাস; কমিউনিস্ট-কংগ্রেসের স্বীকৃতির ইতিহাস, জোতদার-কৃষক-শ্রমিক-মালিক, কৃষক-মজুর সম্পর্ক; সীমান্তসমস্যা-চরদখল, ভূমিবিচ্যুতি, প্রকৃতিকে করায়ত্ত করে রাখার প্রচেষ্টা, বিচ্ছিন্নতা, স্বতন্ত্র রাজ্য দাবি এইসব ঘটনাস্রোতের ভেতর থেকে আলোচনার বিষয় হিসাবে আমরা এখানে নির্বাচন করেছি কেবল কয়েকটি চরিত্রকে।

উপনাসে কেবল নয়, আমাদের দৈনন্দিন জনজীবনে, চেনা পৃথিবীর ভেতর কখনও তারা 'মানুষ' আবার কখনও বা 'না-মানুষ'। এদের অবস্থানকে এখনও আমরা চিহ্নিত করতে পারিনি, এদের উপস্থিতিতে কেবল বিস্মিত হয়েছি মাত্র। বাঘারু যেমন তার নামটাকে তেমন একটা জুতসই মাত্রায় আনতে চেয়েছিল আমরাও তেমন ওদের ধারণ করার একটা তাত্ত্বিক, আভিধানিক অর্ধ-বৃত্তের অনুসন্ধান করেছি। নিম্নবর্গ—প্রান্তিক—সর্বহারা—দারিদ্র্য সীমার নীচে—কখনও বা লেখকের প্রচেষ্টা মাফিক 'উৎপাদন ব্যবস্থার আদিবাসী উপজাতি' বা তাও নয়। চরিত্রগুলো যেমন লেখকের ছকভাঙা বৃত্তের বাইরে এসে ক্রমশ অন্যরূপ ধারণ করেছে আমরাও তেমনই এর তাত্ত্বিক নামকরণের প্রচেষ্টাই বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধির দূরত্বকে আরও আরও প্রসারিত করে চলেছি। তবুও যেন সে-বৃত্ত বাঘারু-কাদাখোয়া-মাদারির মা-মাদারিকে সম্পূর্ণ রূপে ধারণ করতে পারেনি। উপন্যাসের অন্তিমে লেখক এদের নিয়ে বেশ সমস্যায় পড়েছেন কিন্তু স্থায়ী একটা সমাধান খুঁজে পাননি।—

''নৃতত্ত্বে অবিশ্যি এর একটা জবাব আছে। বানর থেকে মানুষ হয়ে ওঠার পাঁচলক্ষ বছর

ধরে যেসব মানবগোষ্ঠী নিজেদের নিয়ত বদলাতে-বদলাতে এসেছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলি গোষ্ঠী সেই আদি মানব সমাজ থেকে আধুনিক মানবসমাজের রূপান্তরের মাত্র হাজার পাঁচেক বছর আর তাল রাখতে পারেনি। তারা সেই পাঁচ হাজার বছরের ভেতরে কোন একটা স্তরে ঠেকে গেছে। যেমন আন্দামান-নিকোবরের জারোয়া, উঙ্গি, সেনটিনেল বা কেরালার গুহামানবরা। তেমনি নদী অরণ্য এইসব প্রাকৃতিক বিষয় বদলে দিয়ে যে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরী হচ্ছে, তার সঙ্গে বাঘারু মাদারির মা ও মাদারি তাল রাখতে পারেনি তারা ঐ আদি একটা স্তরে আটকে গেছে। এদের জন্যে অর্থনীতিতে একটা নতুন নামও তৈরী করা যায়, 'উৎপাদন ব্যবস্থার আদিবাসী-উপজাতি'। কিন্তু এরকম নৃতাত্ত্বিক তত্ত্ব বা তুলনা দিয়ে বাঘারু সমস্যা সামলানো যাবে না।"[১১]

বাঘারু আমাদের পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক বাস্তবতা এবং প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতার গভীরে প্রোথিত প্রচ্ছন্ন মূল। উন্নত আধুনিক সভ্যতার দূরদৃষ্টি যেখানে পৌঁছায় না তাই সে ভবিষ্যত বিবেচনা না করেই মাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মূলকে বিচ্ছিন্ন করে এগিয়ে যেতে চায়। পিছে পড়ে থাকে বিচ্ছিন্ন প্রাণসত্তা, সংযোগ রক্ষাকারী, প্রাণরস প্রবাহী সেই মূল। উপন্যাসের শুরুতে তিস্তার ব্যারেজ সংক্রান্ত যে-জমি জরিপের প্রসঙ্গ আছে তার পূর্বেরও একটা ইতিহাসের উল্লেখ লেখক করেছেন যা এই উপন্যাসের ইতিহাস। উপন্যাসের ঘটনাবলীর নিয়ন্ত্রক সে-ইতিহাস। লেখক বললেন—

"সে ইতিহাস তো প্রতিদিন, প্রতিবছরের নানা ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখন যেমন তিস্তায় ব্যারেজ বেঁধে তিস্তার খাত পাকাপাকি স্থির করা হচ্ছে, সেভাবে ত আর ইতিহাসে ব্যারেজ বেঁধে ইতিহাসের ঘাত ঠিক করা যায় না। ইতিহাসের ঘাত সবসময়ই মুক্ত তিস্তার মতন। কখনো সে ডাইনে পাড় ভাঙে, কখনো বাঁয়ে। একই বর্ষার শুরুতে সে তার পুরনো চর উৎখাত করে বয়ে চলে। সে বর্ষার শেষে নতুন চর ফেলে সরে যায়। সে ইতিহাস এই গোটা ভারতেরই হোক, বা এই তার এক রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেরই হোক, অথবা, পশ্চিমবঙ্গেরই একটা অংশ এই উত্তরবঙ্গেরই হোক ... কিন্তু কোনো-কোনো সময় দেখা যায় উত্তরবঙ্গের মত এক অনির্দিষ্ট ভূখণ্ডেও ইতিহাস একটা আকার পেতে চায়। বা হয়ত সব খণ্ড অংশেরই একটা নিজস্ব ইতিহাসের গতি আছে। বড় ইতিহাসের গতির সেটা অনুকূলও হতে পারে, প্রতিকূলও হতে পারে। বড় ইতিহাস নিজের বড়ত্বের চাপে কখনো বা সেই প্রতিকূলতাকে দুমড়ে মুচড়ে দিতে পারে, কখনো বা সেই প্রতিকূলতাকে নানা মোড়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনুকূলতার স্রোতে মিশিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় সেই আঞ্চলিক খণ্ডের ইতিহাসের বাঁকা পথ কিছুতেই আর সোজা হচ্ছে না, শেষ পর্যন্ত তা হয়ে দাঁড়ায় মূল ইতিহাসের অসম কিন্তু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।" [১২]

তিস্তা ব্যারেজ এরকমই একটি আঞ্চলিক খণ্ড ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। মালদা-দিনাজপুর পোলিয়া রাজবংশী ও কোচবিহার-জলপাইগুড়ির রাজবংশীরা মিলিতভাবে মাঝে মাঝেই তাদের আদিবাসী সত্তার প্রাধান্য চেয়ে স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি নিয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। এর থেকেই 'উত্তরাখণ্ড পাঠি' বা উত্তরখণ্ড আন্দোলনের উদ্ভব। দার্জিলিং জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি এই সংযোগ আর জলপাইগুড়ির ওদলাবাড়ি থেকে গরুবাথান-লাভা-আলগাড়া হয়ে কালিম্পং, পাহাড় সমতলের এই সংযোগপথে ধাপে ধাপে অনেক চা বাগান অবস্থিত, পাথরঝোরা, শুড়িবাড়ি, ছোটফাগু, বড়ফাগু। এর মাঝেই জলপাইগুড়ি জেলা শেষ আর দার্জিলিঙের শুরু হলেও সর্বত্রই নেপালি শ্রমিক ও নেপালি অধিবাসী আর তাদের মুখের ভাষা। এই ভৌগোলিক অবস্থানের মানুষেরা চায় তাদের স্বতন্ত্র ভূগোল। মুখের ভাষা আর বঞ্চনার অর্থনীতিকে অবলম্বন করেই স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি করে তারা। সে-দাবিকে কাগজে কলমে গোর্খাল্যাণ্ড বলা হয়। পাহাড়ি মানুষগুলো যখন হিসাব করে যে পার্বত্য এলাকা থেকে কত কাঠ, কত চা নীচে যায় তার থেকে সরকারের আয় কতটা আর তার মূলে পাহাড়ের মানুষজনের জন্য ব্যয় কতটা, এ হিসাব যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয় তখনই তাদের আহত আত্মসম্মানবোধ জেগে ওঠে। আর নিজেদের মাতৃভাষার অস্বীকৃতির জন্য দুঃখ ওদের বিদ্রোহী করে, নিজেদের উপেক্ষিত মনে হয়। পার্বত্য এলাকার প্রতি দীর্ঘ দীর্ঘ দিনের উপেক্ষায় স্বতন্ত্র রাজ্য দাবির কারণ হয়ে ওঠে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প চালু হয়। এতে পাহাড়ি অঞ্চলের কোনও উপকার নেই। পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ বোঝে তাদের আরও বেশি বঞ্চিত করাই তিস্তা ব্যারেজের উদ্দেশ্য। 'তিস্তা ব্যারেজের আসল মতলব পাহাড়ের নদীর জল সমতলের জন্য টেনে নেয়'। তারা চোখের সামনে দেখে তিস্তার জলকে এক জায়গায় আটকে তিস্তাকে একট মূলখাতে বইয়ে দেওয়ার কাজ চলছে। দেখতে দেখতে ফরেস্টের ভিতরের নির্জন জায়গার চেহারা বদলে গেল, তিস্তার বুকে অন্ধকার রাত্রিতে আলো জ্বলে উঠল। অথচ তিস্তার উপর ইংরেজদের তৈরি করা কয়েকটি সাঁকো ছাড়া নতুন করে আর কোনও কাজ এত বছরে হয়নি। পাহাড়ি মানুষ ভাবে—'ওরা আমাদের নদীও লুটে নিচ্ছে, আমরা এ হতে দেবো না তিস্তা ব্যারেজ ভাঙতে হবে'। এর সঙ্গে যুক্ত হয় তিস্তার চরের নমশূদ্রদের সংগঠন। মালবাজার-ওদলাবাড়ির কাছে মউয়ামারির চর থেকে শুরু করে হলদিবাড়ি কাশিবাড়ি পর্যন্ত তিস্তার মাঝখানে লোকবসতি তৈরি হয়েছে অনেকদিন আগে। পূর্ব বাংলার নমশূদ্ররা প্রথমে এই চরগুলিতে বসতি গড়ে তোলে। আর রাজবংশীরা বসতি গড়ে তিস্তার পারে জঙ্গলের মধ্যে। তাই নমশূদ্ররাই প্রথমে তিস্তার চরগুলি দখল করে। কিন্তু ১৯৫০ সালের বন্যায় প্রথমে তিস্তার চরগুলি ভেসে যায় তবে তখনও চরের দখল সেভাবে স্থায়ী হয়নি। তখনও তাদের জীবন অনিশ্চিত, ১৯৫৮ সালের বন্যা আরও ভীষণ রূপ ধারণ করে তিস্তা ব্রিজের পাশের বাঁধ ভেঙে শহরে ঢোকে। মাউয়ামারির চর থেকে বোয়ালমারির চর সমস্তটা বানে ভেসেছে। এই বন্যার পিছনে

সরকারি বিভাগেরও কিছু ভূমিকা ছিল। ৬৮-র বন্যার পর তিস্তা সম্পর্কে আরও বৈজ্ঞানিক ও সংগঠিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর মধ্যেই তিস্তা ব্যারেজের কাজ প্রথম দফা শেষ হয়। তিস্তার জল যাতে পাহাড় থেকে আচমকা নেমে সমতল ভাসিয়ে দিতে না পারে তার জন্যে তিস্তার মাঝামাঝি এই ব্যারেজ বাঁধা হয়েছে। কিন্তু তিস্তার চরে এখন পাকাপাকি বসতি স্থাপিত হয়েছে। ৬৮-র বন্যাও তাদের উচ্ছেদ করতে পারেনি, জল নামতে আবার চাষীরা বসতি স্থাপন করেছে। পরে চরগুলিতে নমশূদ্র ও রাজবংশীদের মিশ্র জনবসতি গড়ে উঠেছে।

'চরগুলিতে একটা অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চালু হয়েছে—উৎপাদনের ভুমিকা থেকে তৈরি গণতন্ত্র, বন্যায় তিস্তার চরের ভূখণ্ড পাল্টে গিয়েছে সেই পরিবর্তিত ভূখণ্ডে চরুয়ারাও নিজেদের পুনর্বিন্যাস করে নিয়েছে। তাতে হয়তো দেখা যাবে কোনও চর আর নেই, আবার নতুন চর দেখা দিয়েছে। এই সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যেই তিস্তার ব্যারেজের কাজ শুরু হলে চরগুলির অবস্থা কী হবে। তিস্তার জল কে নিয়ন্ত্রণ করবে। পুরোনো চর ভেসে যাবে নতুন করে চরও গঠিত হবে না, তাহলে চরুয়া মানুষগুলিকে উচ্ছেদ করা হবে তাই তারা এই সরকারি প্রকল্পের বিরোধিতা করে। কারণ তখন

> ''হিমালয়ের তুষারগলা জল আর মৌসুমী মেঘের বৃষ্টি ধারায় তিস্তার জল যতই বেড়ে উঠুক, তা বয়ে যাবে মানুষের নির্দেশিত খাতে, নির্দেশিত গতিতে। তখন চর জেগে উঠবে মানুষের ইচ্ছায়। সে চরকে সবুজ করে দিয়ে নদী তার পাশ দিয়ে অনুগত বয়ে যাবে মানুষের তৈরি নিসর্গে।''

তাই চরের নমশূদ্রদের সংগঠনও যুক্ত হয় উত্তরখণ্ড, কামতাপুর, গোর্খাল্যাণ্ড- আন্দোলনের সঙ্গে। তবে এতগুলো আন্দোলনের বিরোধিতার মধ্যে কোনও ঐক্য ছিল না। তবুও এতগুলি আন্দোলনের বিরোধিতার সামনে সরকার তিস্তা ব্যারেজের কাজের গতি বাড়িয়ে দেয়। আংশিক কাজ সম্পূর্ণ করেই ব্যারেজ উদ্বোধনের আয়োজনও শুরু হয়ে যায়। যেহেতু প্রতিপক্ষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাই সরকার তার নিজের রাজনৈতিক শক্তিকে সংহত করতে পারে।

> ''বামফ্রন্টের ভেতরকার পার্টিগুলো ত আছেই, বাইরের পার্টির মধ্যে কংগ্রেস-এর পক্ষে রাজনীতিগত ভাবে এই সব দলের কোনোটিকে প্রকাশ্যে সমর্থন দেয়া অসম্ভব। সুতরাং এই অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ঐক্যের সঙ্গে তিস্তা ব্যারেজের আংশিক কাজ সম্পূর্ণ করে যদি উদ্বোধন ঘটানো যায়, তা হলে উত্তরবঙ্গের লোক হাতেনাতে প্রমাণ পাবে যে এই সরকার তাদের কথা কতটা ভাবছে।'' [১৩]

এরই সঙ্গে সরকার দার্জিলিং জলপাইগুড়ি-র চা বাগানের যেখানে তাদের ইউনিয়ন আছে সেখানকার পাহাড়ি মানুষদের একত্রিত করেছে। জলপাইগুড়ি-কোচবিহারের কৃষক সংগঠন গুলিকেও প্রচারে

নামিয়েছে। পাহাড়ের মানুষ ও রাজবংশীদের মধ্যে তারা বহুদিন ধরে বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে প্রচার করে এসেছে। তাই তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধনে উত্তরখণ্ড, কামতাপুর, গোর্খাল্যাণ্ডের দল বিক্ষোভ দেখালেও সে-বিক্ষোভ তিস্তা ব্যারেজ পর্যন্ত পৌঁছাবে না। পৌঁছাতে দেওয়া হবে না। সরকারের দলগুলিও সারা জেলা থেকে মিছিল নিয়ে ব্যারেজে যাচ্ছে সমর্থন জানাতে। নির্বাচনের তখন মাত্র কয়েক মাস বাকি। ব্যারেজ উদ্বোধন আসলে নির্বাচনী অভিযানের শুরু। তিস্তা ব্যারেজ তাই গভীর রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক একটি প্রকল্প।

তিস্তা ব্যারেজের এই রাজনীতি, এই ভূগোল ইতিহাসের মধ্যে বাঘারু মাদারিরা হয়তো কোথাও নেই, আবার এ সবের ভেতরেই গভীর ভাবে যুক্ত হয়ে আছে বাঘারু সমস্যা। বাঘারু মাদারির মা-র জীবন এসব কিছুর প্রান্তে অবস্থান করলেও এই নিয়ন্ত্রণ শক্তিই পরিচালিত করে ওদের জীবনকে। তাই বাঘারুর অস্বীকৃতির পরেও আমাদের বিশ্লেষণ করতেই হয় এরই সঙ্গে অঙ্কিত বাঘারুদের জীবনকে। কারণ প্রান্তিক বাঘারুদের জীবনকে সমাজ গভীরের প্রচ্ছন্ন শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তো চলবে না। পরিশিষ্টে লেখক বলেছেন—

> ''এই 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' সেই প্রাকৃতিক তিস্তার সঙ্গে মানুষজনের সহবাসের রীতিনীতির বৃত্তান্ত। গয়ানাথের সঙ্গে তিস্তার সহবাসের একরকম রীতিনীতি, নিতাইদের সঙ্গে আর এক রকম আর সীমান্তবাহিনীর সঙ্গে আরো একরকম। বাঘারুর রীতিনীতি বলতে কিছু নেই। তিস্তা তার নদীস্বভাবে প্রাকৃতিক, সে জল ছাড়া কিছু নয়। বাঘারু তার মানবস্বভাবে প্রাকৃতিক—সে কেবল মানুষ, একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়।'' [১৪]

উপন্যাসে বাঘারুর প্রথম উপস্থিতি দেখা যায় চৌদ্দ পরিচ্ছেদে 'ফরেস্টারচন্দ্রের আত্মঘোষণা'। বাঘারুর উপস্থিতিটাই যেন এ লহমায় তার অবস্থানকেও চিহ্নিত করে দেয়, সেই সঙ্গে তার বাঁচার লড়াইকেও।

> ''—তারপর সেই অন্ধকারটা ফুঁড়ে একটা মানুষের দাঁড়ানোর নানা চেষ্টা আর বারবারই পড়ে যাওয়া ঘটতে থাকে—নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া ডুবো মানুষের যেমন হাবুডুবু দেখা যায়। তার দাঁড়িয়ে ওঠাটাই যেন একটা কঠিন কাজ হয়ে ওঠে তার পক্ষে।'' [১৫]

একসময় লোকটা দাঁড়িয়ে ওঠে, তবে সম্পূর্ণ কায়াধারী একটা মানব-আকৃতি নয়, শুধু একটা ছায়ামাত্র। এ তো গেল লোকটির চেহারা এরপর কণ্ঠস্বর। অনেকক্ষণ পর, মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বললে যেমন আত্মগত আওয়াজ বেরোয় গলা দিয়ে তেমনি স্বরে লোকটি ডাকে,—

'হু-জ্-উ-র'।

'হা-কি-ম'

'সা-হে-ব'

‘লোকটি যেন তার হুজুর-হাকিম-সাহেবের আকাশ থেকে নেমে আসাটা দেখে’। তারপর সম্পূর্ণ অর্থবোধক একটি বাক্যে নিজের পরিচয় দেয়, তার উপস্থিতিটা বুঝিয়ে দেয়—

> ‘হুজুর মুই আসি গেছু, মুই ফরেস্টার চন্দ্র বাঘারু বর্মন’
>
> ‘হু-জু-উ-র, মুই ফরেস্টার চন্দ্র আসি গেইছু’
>
> ‘হুজুর, আসি গেইছি। মুই ফরেস্টার চন্দ্র। ফরেস্টার বাঘারু বর্মন, দেখি নেন। টর্চ ফিকেন, কি ম্যাচিসের কাঠি জ্বালান। দেখি নেন। ওয়ান-টু-থিরি’

এবার পাঠকের চোখের সামনে সম্পূর্ণ বাঘারু, সত্যি বাঘারু। লেখক তার বর্ণনা দেন যেন সত্যি পাঠকের টর্চলাইটের সামনে এসে সে দাঁড়িয়েছে। বাঘারুর অঙ্গ সঞ্চালনাও সেই রকম। এখন পাঠক দেখতে বাধ্য। সমালোচক বলেছেন—

> ‘‘আমরা তাকে দেখতে না চাইলেও দেখতে তখন বাধ্য হবো। আমরা তার কথা শুনতে না চাইলেও বুঝতে পারবো যে তার কথা না শুনে আমাদের আর কোনো উপায় নেই। সে এভাবেই লণ্ডভণ্ড করে দেবে আমাদের দেখা এবং আমাদের শোনার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে। আমাদের মাথা ও চেতনাকে তখন ধাক্কা দিতে থাকবে তিনটি ক্রিয়াপদ—আসি গেছু, আসি গেইছু, আসি গেইছি। এ যেন কর্তা-র (অর্থাৎ ‘কেন্দ্র’-এর) পরিবর্তে ক্রিয়া-র (অর্থাৎ ‘প্রান্তিক’-এর) উত্থান দেখা দিল বাংলা উপন্যাসে। এ যেন আধুনিকতার পরিবর্তে উত্তর আধুনিকতার দিকে সম্প্রসারিত চেতনা বদল। এ যেন ঔপনিবেশিক বাস্তবতার বিরুদ্ধে উত্তর ঔপনিবেশিক বাস্তবতার ক্রমপ্রসারণশীল ভাষ্যস্থাপন।’’ [১৬]

বাঘারুর কণ্ঠস্বর, তার একটা বক্তব্যও পাঠক শুনল কিন্তু ঔপন্যাসিক তাকে বাঘারুর সংলাপ বলছেন না। তখন সে আত্মগত, নিজেই বক্তা, নিজেই শ্রোতা। আসলে বাঘারু তখন মহড়া দিচ্ছিল। তাকে শেখানো কিছু কথা নিজেনিজেই বলে চলেছে, যেন তার সামনে তার প্রতিপক্ষ উপস্থিত। প্রতিপক্ষ অনুপস্থিত হলেও দর্শকাসনে উপস্থিত ছিল উপন্যাসের পাঠক। বাঘারু তার জোতদার গয়ানাথের শেখানো সংলাপ বলতে শুরু করল—

> ‘‘শুন হে হুজুর, কাথা মোর একখান ... একখান কাথা হইল যে তোমরা ত জমির হাকিম। ত মোর নামখান তুমি কাটি দাও। মোর একখান ত জমি আছিল। আপলচাঁদ ফরেস্টের গা-লোগো। মোক ঐঠে পাঠায় গয়ানাথ জোতদার। হাল-বলদ বিছন সগায় ওর মুই হালুয়া আছিল্ কয়েক বছর। অ্যালায় আর নাই। মোর নামখান কাটি দাও। ঐ জমিখান লিখি দাও গয়ানাথ জোতদারের নামও। বলদ যার, বিছন যার, হালুয়া যার, ধান যার—জমি ত তারই হবা নাগে হুজুর। ত ঐ জমিখান মুই, ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারু বর্মন, ছাড়ি দিছু। লিখি দাও, শ্রীফরেস্টারচন্দ্র বাঘারুবর্মনক এই জমিঠে উচ্ছেদ দেয়া গে-এ-এ-ই-ল।’’ [১৭]

ফরেস্টের নামে বন্দোবস্ত করা জমি আবার গয়ানাথ জোতদারের হাতেই চলে যায়। বর্গা-অপারেশনের পর গয়ানাথ জোতদারের আধিপত্যবাদী অবস্থান এখানে চিহ্নিত হয়ে যায়। এরপর দেখা যায় উপন্যাসে বাঘারু আস্তে আস্তে নীরব হয়ে যায়, কেবল গয়ানাথের আদেশেই তার চলমানতা দেখা যায়। তিস্তাপাড়ের জমি জরিপের আয়োজনে সার্ভে অফিসার সুহাসের জন্য চেয়ার বহন করা থেকে চেয়ারের পায়া মোছা, তিস্তার হাওয়ায় উড়ে যাওয়া মৌজা ম্যাপটা গাছ থেকে নামিয়ে আনা, কিংবা বর্ষার খরস্রোতা তিস্তায় গয়ানাথের জোতের সীমা নির্দেশ করার জন্য প্রাণ হাতে সাঁতরে যাওয়া, সব কিছুই বাঘারু গয়ানাথের আদেশেই করে যায়। আর তার জোতদারের কাছে বাঘারু তো বাঘারু। আর কোনো পরিচয় তার নেই, নামের আড়ালের মানুষটা অস্তিত্বহীন। তাই গয়ানাথ সুহাসের অপ্রস্তুত চিৎকারের সামনে অনায়াসেই বলে—'ছাড়ি দেন স্যার, অ ত বাঘারু'।

যে মৌজ ম্যাপের সাহায্যে ব্যারেজের জমি মাপা হয়, পরোক্ষে যার সাহায্যে বাঘারু উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, সে-যজ্ঞে সাহায্যকারী একমাত্র বাঘারু। আবার তিস্তাকে সার্ভে ম্যাপের অন্তর্ভুক্ত করে সে-ই। সুহাসের মনে হয়—

> ''কিন্তু তিস্তার পেটে গয়ানাথের জমিতে গয়ানাথ তার দখলের প্রমাণের কথা তুলেছে যখন থেকে, যেন এই নদী আসলে নদী নয়—গয়ানাথের জোত, তখন থেকেই তিস্তা যেন আর দৃশ্য থাকছিল না, হয়ে উঠছিল তার এই সার্ভেরই ঘটনাস্থল। আর এখন তিস্তা নদীর এই দিগন্ত-ছাপানো বিস্তারে, ঐ দুটো প্রায় অদৃশ্য মানুষ জলের ফেনার মত ভেসে যেতে-যেতে তিস্তাকে যেন ঢুকিয়ে দিচ্ছিল সার্ভে ম্যাপের লাইনের মধ্যে।'' [১৮]

সুহাসের সার্ভের আয়োজনে তিস্তার পাড়ে উপস্থিত ফরেস্টের জমি দখলকারী রাজবংশী জোতদার গয়ানাথ, পূর্ববঙ্গের নামশূদ্রের চরের দল, কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক সদস্য তাদের বিরুদ্ধ পক্ষের চা বাগানে মজুর ইউনিয়নের লোকেরা : এইসব কৃষক-শ্রমিক রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে জমিজরিপের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। নেই কেবল বাঘারুর সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক তবুও বাঘারু সেখানে হাজির আজ্ঞাবাহক হিসাবে। এখানে তার ভাষাধারী অস্তিত্ব অনুপস্থিত এখানে সে যেন এক নির্বাক চলচ্চিত্রের অংশ মাত্র, কোনও সংলাপ তার নেই। তার ভাষা, তার সংলাপ পেতে আমাদের অতিক্রম করতে হয় অনেকটা পথ। জমিজরিপ গয়ানাথী পদ্ধতি, জনসমাবেশ, কৃষক সমিতির 'প্রোগ্রাম', কৃষক মজুর আলোচনা, লেনদেন-শ্রেণীসংগ্রাম,—পেরিয়ে বাঘারুকে আবার আবিষ্কার করা যায় ঊনচল্লিশ পরিচ্ছদে। কৃষক মজুর আলোচনার মাঝে গয়ানাথের আদেশে চেয়ার বাহক বাঘারু হাজির কিন্তু সমস্যা তার 'নেংটিপরা ঢ্যাঙা শরীরটা নিয়ে'।—

> ''যদি বাঘারু ছোটখাট হত, বা অন্তত একটু রোগা, ভিড়ের ভেতর দাঁড়ালেও যদি ওকে

দেখা না যেত, যদি মিশে যেত ভিড়ের সঙ্গে, তা হলেও তাকে খেয়াল না করে থাকা যেত। কিন্তু এই বাঘারুটা তো একটা পুরনো শাল-গাছের মত—তার শ্যাওলা ছাতাধরা শরীরে সবাইকে আড়াল করেই তাকে দাঁড়াতে হয়। এমন কি তার নেংটিটাও তার শরীরের সঙ্গে এমনই মিশে আছে যে বাঘারু যেন সত্যিই একটা গাছই। কৃষক মজুরের সমাবেশেও বাঘারু বেমানান।"

তাই তাকে বলতেই হয়—

'হে-ই বাঘারু, সরি যা কেনে।'

'হে পাহাড়টো, তফাত হো ভাই'।

মূল স্রোত থেকে বাঘারুরা সরে না গেলে, বিলুপ্ত না হলে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। সভ্য জগতে বাঘারুরা তাই বড় বেমানান। বাঘারু খাদাখোয়া, মাদারির মা এর সকলেই তাই বড় বেশি জঙ্গল ও নদী সংলগ্ন। জঙ্গল নদীতে তারাও বড় বেশি সচ্ছন্দ। কারণ জনসমাগম, জনবসতির ভেতর বাঘারু স্বাধীন নয়, তার সত্তারও মালিক আছে, তার সংলাপেরও মালিক আছে, গয়ানাথ জোতদার। কিন্তু ফরেস্টের ভেতর সে স্বাধীন। এম. এল এ'কে কাঁধে নিয়ে নদী পাড়ের জন্য বাঘারুকে প্রেরণ করে গয়ানাথ। এম. এল. এর সঙ্গে সারাটা পথ এসে স্বাধীন বক্তব্য রাখে সে জঙ্গলের সংস্পর্শে।—'কয়েক পা যেতেই বনের গন্ধ সারা শরীরে ভর করে'। এরকম সময়েই এম. এল. এ জিজ্ঞাসা করে বসে,—

'তোমরালার নামখান কী হে?'

''গয়ানাথ ত মোক নাম দিছে বাবু। গয়ানাথ মোর মাও-এর দেউনিয়া মোর দেউনিয়া, জমির দেউনিয়া, ফরেস্টের দেউনিয়া, তিস্তা নদীর দেউনিয়া, ভোটের দেউনিয়া। ত ধারো, এ্যানং একখান ভোটের আগত কহিল, হে বাউ, ভোটত তয় নামখান দিয়া দিছু। ত মুই পুছিলো, কী মোর নামখান। ত কহিল, ফরেস্টচন্দ্র বর্মন, মনত রাখিস ফরেস্ট চন্দ্র বর্মন। ত মুই মনত রাখি দিছু—ফরেস্ট চন্দ্র বর্মন। মনত রাখি ভোট দিছু—গয়ানাথের ভোট।"

কেন্দ্ররাজ্যের রাজনীতিতে, বাঘারুরা নিজের ভোট আর কবেই দিয়েছে তারা জেনেই এসেছে ভোট অন্যের জন্যই দিতে হয়। বাঘারু তার নামের প্রসঙ্গে বলেছে এরপর সে দেখে ফরেস্টার সাহেব মিলিটারির মতন ফরেস্টের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে 'য্যান মাঘনা হাতি'। বাঘারুর হয়তো নিজের অবস্থা বদলের ক্ষমতা না থাকলেও নাম বদলের কিছুটা সুযোগ এসে যায়। ফরেস্টারের সাদৃশ্যে নিজেকে ভাবতে কোথাও যেন তার একটু গর্ব বোধ হয়—

'মুই মোর নামখান বদলি ফরেস্টার করি নিছু, মোর পাকা নাম'।

কিন্তু এ নামেই সে বরাবর পরিচিত নয়, তার নামটা জন্মের আগে থেকেই বদলে বদলে এসেছে। জন্মের আগে বাঘারু, 'কুড়ানিয়ার ছোয়া', জন্মের পর বাঘারুর মার জঙ্গলে বাঘারু প্রসব আর হাতের কুড়ুল দিয়ে নাড়ী কাটার সূত্রে বাঘারু হয়ে যায়—'কুড়ালিয়া কাটা'। জঙ্গলে বাঘের সামনা সামনি লড়াইয়ে বাঘকে হারিয়ে তার নাম হয়ে যায় বাঘারু—

> ''সেইটে মোর নাম হয়া গেইল বাঘারু। বাঘাখানক মুই হারি দেছু, স্যালায় মোর নাম হইল বাঘারু। যায় জেতে তার নামখান ত একড [রেকর্ড] হয়। বাঘাখানা মোক মারিলে এই জায়গাখানার নাম ধরিত বাঘাখোয়া।''

হার-জিতের আধিপত্যবাদকে সে এভাবেই বুঝে নেয় নিজ অভিজ্ঞতায়। তার নামের মধ্যে কেমন একটা ছন্দ এসে গেছে, একটা গানের সুর—'পুরা একখান পালাটিয়া গান বান্ধ্যা হয়্যা গেইল—কুড়ানির ছোয়া, কুড়ালিয়া-কাটা, বাঘারুয়া, ফরেস্টুয়া, চন্দ্রবর্মন।' কিন্তু বাঘারু চায় একটা মানুষের নাম, সে তো একটা মানুষই। জোতদার গয়ানাথ বা তার পারিপার্শ্বিক জগৎ অস্বীকার করলেও বাঘারু নিজে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে কেমন করে। তাই এম. এল. এর কাছে তার আবেদন—

> ''মুই না চাও পালাটিয়া গান ... মোক একখান মানষির নাম দেন'। 'তুমি একখান জ্যান্ত এমেলিয়ার ঘর। বাগানিয়া মানষিক ঝাণ্ডা দিছেন, বস্তির মানসিক জমি দিছেন আর মোক একখান নাম দিবার না পারেন? এ ক্যানং হাকিম হযা ধরিছু তুই, এমেলিয়া?''

বাঘারু মানুষ হয়ে যেতে চায়, সম্পূর্ণ একটা মানুষ, তাহলে বোঝা যায় বাঘারু বোধহীন নয়। তবে বোধের জাগতিক বিস্তার থেকে সে মাঝে মাঝে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চায়। তখন বাঘারু আর প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়তো বা তখন প্রকৃতি হয়ে যায় ব্যক্তি, বাঘারুর দোসর। তখন সেই প্রকৃতি চরিত্রের সাথেই বাঘারুর সব সংলাপ চলতে থাকে। সেখানে সে নির্ভয়, তার সংলাপের ফল ভোগ করতে হয় না। অথচ এমেলিয়া (এম-এল-এ)-র সঙ্গে প্রথম সংলাপের ফলেই তাকে অপলচাঁদ ছাড়তে হয় গয়ানাথের জোতজমি ছেড়ে, নির্বাসিত হতে হয় তার পরিচিত নদী জঙ্গল ছেড়ে ডায়না নদীর চরে, গয়ানাথের মহিষের বাথানে। যদিও এতে বাঘারুর যে কোনও আপত্তি অভিযোগ অসুবিধা থাকে এমন না। কোনও কিছুতেই তার কিছু আসে না কারণ ইচ্ছে করলে তো সে তার অবস্থানের বদল ঘটাতে পারে না। গয়ানাথের আধিপত্যের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতেও পারে না। সে-ইচ্ছাও কখনও প্রকাশ করে না বাঘারু। এম. এল. এ-র সহানুভূতির ফলে বাঘারুর নির্বাসন ঘটে—গয়ানাথ আশ্চর্য হয় বাঘারুও কথা বলতে জানে একথা জেনে, সে এম-এল-এ-র সাথে তার নিজের সমস্যা আলোচনা করবে এ যেন অকল্পনীয়।

‘তোমার তানে কাথা কহিছে ঐটা, এততত?’ সদয় এম-এল-এ বলে গয়ানাথকে—‘চারিপুহে এ্যাত জমি তুমার আর ঐ মানষিটাক আধিয়ারি দিবার না পারেন?’ ফলে বাঘারুর প্রথম সংলাপ আর নির্বাসন। একটা কারণ একটা ফল। এই কারণ আর ফল সম্পর্কে বাঘারু যে একেবারে নির্বোধ এমন নয়। সে বোঝে—

> ‘‘গয়ানাথ মোক এইঠে পাঠাচ্ছে। বাথান করিবার লেগে। মুই আধি চাই নাই। মোক বাথান দিছে। এইঠে মোক কারও খুঁজি পাবেন না। মুইও কাক পাম না। মুই এইঠে আগত আসি নাইরো। মুই এইঠেকার বন চিনি নাইরো গয়ানাথ মোক এইঠে পাঠাছে। মোর অচিনা জায়গাটাতে পাঠাছে। মোক উদাস করিবার তানে পাঠাছে।’’ [পৃ: ১৭৫]

আস্তে আস্তে বাঘারু আর প্রকৃতি একাকার, উভয়ের পরিপূরক হয়ে যায়। যাত্রাপথে আকাশে চাঁদ, ভোরের পর সূর্যোদয় সবই আলাদা অর্থবাহক। চাঁদ যেমন একটা নতুন দুনিয়া তৈরি হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দেয়—‘সেই নতুন দুনিয়ায় এখন পর্যন্ত এক বাঘারু আছে আর ঐ চাঁদ আছে’। তেমনই জীবনের সমস্ত ক্লেদ মুছে সূর্য এসে রাঙিয়ে দেয় বাঘারুর সমগ্র সত্তা—‘বাঘারু তার নিজের শরীরের দিকে তাকায়—‘সারা শরীলখান কায় অং মাখাছে’—বাঘারু পায়ের তলার ঘাসের দিকে তাকায়—

> ‘‘ঘাস গিলা সব আয়না হয়্যা যাচ্ছে—... বাঘারু মুখ ঢাকতে দুই হাত তুললে হাতের তালু আলোতে, রঙে ভরে যায়, যেন বাঘারু নিচু হয়ে মাঠ থেকে আঁজলা ভরে আলো আর রঙ তুলে আনল। এখন তার চোখের সামনে দুই অঞ্জলি থেকে সেই রঙিন আলো ঝরঝর ঝরে পড়ে শরীরে। নিজের হাতর আঁজলায়, নিজের শরীরে এই প্রথম রঙ-আলো ঢালছে বাঘারু;’’ [১৯]

আলোর সেই নিমজ্জনে বাঘারুকে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতেই হয়—‘এই বারঘরিয়র মাঠে সে কখন পৌঁছবে তার জন্যেই যদি সূর্যোদয় ততক্ষণ ঠেকে থাকে, তা হলে তা বাঘারুকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতেই হয়।’ কখন যেন তার খেয়াল হয়—‘মুই খালি-খালি খাড়া আছি’। তার উদোম ঢ্যাঙা শরীরের ভারহীনতা তাকে বুঝিয়ে দেয় সে মুক্ত, তার কাঁধে ‘গয়ানাথের লাঙল’ নেই। ‘মোর কাঁধত গাছ নাই গয়ানাথের গাছ’। তাই বারঘরিয়ার মাঠে সূর্যোদয়ের সামনে নির্বাসনের পথে, এই প্রথম ‘বাঘারুর শরীরে মনে কেমন মুক্তির বোধ এসে যায়’। এই বোধটাকে উপলব্ধি করতে নিজের শরীরের দিকেই তাকে ফিরে ফিরে তাকাতে হয়। কারণ ‘বাঘারুর ত শরীর ছাড়া কিছু নেই’। শাল গাছের মতো একটা শরীর, বাতাস লাগা শিরীষ গাছের মতো একটা শরীর। এই শরীর দিয়েই তাকে উপলব্ধি করতে হয় তার প্রথম মুক্তির স্বাদ।—‘শরীরটা এই প্রথম তার নিজের হয়ে উঠেছে যেন’। ‘কাঁধে, ঘাড়ে, পিঠে, বাহুতে, কোমরে, উরুতে, কটিতে, আলোর স্বাদ

পেতে ভালো লাগে বাঘারুর—আলোর উষ্ণ স্বাদ'। 'সঙ্গীত লাভ', 'অস্ত্রলাভ', 'সঙ্গী লাভ'। 'অর্থনীতি', 'কৃষি বিজ্ঞান', 'রাজনীতি' ছাড়িয়ে বাঘারু পৌঁছে যায় তার নির্বাসনভূমিতে। আর এক জীবনের উপভোগের মুহূর্তগুলো এসে হাজির। এখানে এই ডায়নার চরে গয়ানাথের মহিষ বাথানে পাখি জাগে, নদী জাগে, বাথান জাগে, বাঘারুও জাগে। এখানে বাঘারুর সঙ্গী কুকুর ভোখা; সঙ্গিনী পাখি, বাঘারুর ডাকে যে সঙ্গীর ইশারা পেয়ে তাকে খোঁজে আর, তার ডাক শুনেই বাঘারু বিরহিনী নায়িকাভাবের মইষাল বন্ধুর গান গায়, চলার সাথী মহিষ বুড়িয়াল সকলেই স্বতন্ত্র চরিত্র রূপে দেখা দেয়। বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম বোধহয়, এভাবে অরণ্যপ্রকৃতি, অরণ্যের পশু, পাখি, আর অরণ্যজীবী মানুষ একই সঙ্গে সবাক সংলাপ পেয়ে গেল। সমালোচক বলেছেন—

> ''আজ আমরা মালিকানাহীন যে উপনিবেশোত্তর পাঠবস্তু ও পাঠকৃতির কথা ভাবছি, বাঘারুও 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' যেনবা তারই সন্ধান দিচ্ছে আমাদের। আধুনিক উপন্যাস হিউম্যানিস্ট চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়ে শুধুমাত্র মানুষের মনোবীজকে ধন্য করে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু আজ কীট-পতঙ্গ; গুল্মলতা, পশুপক্ষী এবং তৎসহ প্রান্তিকায়িত মানুষের প্রাকৃতিক ঐকতানে গড়ে তোলা হচ্ছে ভূমিসংলগ্ন বিধিসার সাংস্কৃতিক নব্য সংগঠন।" [২০]

গয়ানাথের বাথান বাঘারুর নতুন পরিচিতি তৈরি করে দেয়। সঙ্গে বাথান থাকলে সবাই তাকে মহিষাল বলে চিনতে পারে। ডায়নার চরের বাথানে এসে বাঘারু আরও ঘনিষ্ঠভাবে প্রান্তিক প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। বাঘারু যেন এই প্রকৃতিরই অংশ, প্রকৃতির ভেতরই তার জন্ম তার নাড়ির টান, প্রকৃতিও যেন বাঘারু ছাড়া সম্পূর্ণতা পায় না।—সভ্যতার আঘাতে বাঘারুর মতোই প্রান্তিক প্রকৃতিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বাঘারুকে যতদূর দেখা গেল, সে যে একেবারেই কোনও প্রতিক্রিয়াহীন এমন নয়, মাঝে মাঝে বাঘারুর কণ্ঠেও অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠাকারী স্বর শোনা যায়। গয়ানাথের জোতজমির মতোই জঙ্গলের ভেতর বাঘারু তার একটা চিহ্ন রাখতে চায়। সে যে ছিল তার প্রমাণ স্বরূপ ডায়নার জঙ্গলের ভেতর একটা স্থানকে চিহ্নিত করে রাখতে চায় 'বাঘারুবাড়ি' নামে। 'হ গয়ানাথ, মোক এইঠে পাঠাছে অচিনা দেশত। আর মুই এইঠে একখান বাড়ি বানি নিছু। বাঘারুবাড়ি।"

'নদীর নাম ডাইনং থানার নাম তাগরাকাটা, গ্রামের নাম, বাঘারুবাড়ি'। ফুর্তিতে হেসে ওঠে বাঘারু, একধরনের প্রতিশোধস্পৃহা তার মধ্যেও হয়তো জন্ম নিয়েছিল জন্মের আগে থেকে। যে-দেউনিয়া তার দখলকারী তাকে একবার অপদস্থ করতে তার মন চায়—'শালো গয়ানাথক গিয়া কহিবু, হে দেউনিয়া, তোমার বাথানখান আছে, ধরো কেনে'। এটাই বাঘারুর কাঙ্ক্ষিত উল্লাস।

তার আনুগত্যের জীবনে এতদিনের অভিজ্ঞতায় বাঘারু কিন্তু জানে যতই সে মুক্তির আনন্দ কল্পনায় মেতে উঠুক, যতই আত্মমগ্ন সংলাপে মগ্ন থাকুক, কেন্দ্রগত উচ্চবর্গীয় গয়ানাথীয় শোষণের থেকে অন্তেবাসী প্রান্তিক বাঘারুদের মুক্তি নেই সহজে। সমস্তটা দখল করে আছে আধিপত্যবাদী কেন্দ্রগত সভ্যতা। তাই বাঘারু এইভাবেই ভেবে চলেছে—

> 'যনং এই পৃথিবীর তামাম মানষি গয়ানাথের আধিয়ার আর হালুয়া। এই পৃথিবীর তামাম, গরু আর মহিষ গয়ানাথের বাথানের গরু আর মহিষ, স্যানং এই পৃথিবীর তামাম জমি, গয়ানাথের জমি, তামাম ফরেস্ট গয়ানাথের ফরেস্ট, ফরেস্টের ভিতর য্যালা হাতি আর বাঘ স্যঅলায় গয়ানাথের হাতি আর বাঘ।' [পৃ: ৯৬]

> 'যে মোষ এই বাথানে যে মোষ ঐ হাটে, যে মোষ গোয়ালে, সব গয়ানাথের। যায়লার জন্ম হইতেছে, যায়লার জন্ম হয় নাই, যায়লা জন্মিবে, যায়লা মরিবে, সব গয়ানাথের।—সগায় গয়ানাথের। এই ডায়নার জঙ্গলখান গয়ানাথের। হু-ই আপলচাঁদের জঙ্গলখান গয়ানাথের। এই ডায়না নদীখান গয়ানাথের। হু-ই তিস্তা নদীখান গয়ানাথের। ঐঠে জমিগিলান গয়ানাথের। এইঠে জঙ্গলখান গয়ানাথের ... এই বাঘারু মইষাল গয়ানাথের।'

> 'এই বাঘারুখান গয়ানাথের'। গয়ানাথের গাছের সঙ্গে বন্যার স্রোতে ভাসতে ভাসতেও বাঘারুর মনে হয় 'গাছগিলা গয়ানাথের, পাখিগিলা গাছের, পাখিগিলা গয়ানাথের না হয় ... গয়ানাথের ঝড় গয়ানাথের গাছক উপড়ি দিছে। ... গয়ানাথের বাঘারু মুই গয়ানাথের গাছ নিগি ভাসিছু'। [২১]

বৃক্ষপর্বে, বাঘারুর প্রত্যাবর্তন। একশ কুড়ি পরিচ্ছেদ থেকে বাঘারু আর তার জোতদার গয়ানাথের আর এক বোঝাপড়ার সম্মুখীন হয় পাঠক। বন্যায় গয়ানাথের ফরেস্টের অধিকৃত চারটি গাছকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তাই গয়ানাথের নির্দেশে, গয়ানাথের বাঘারু গাছের সঙ্গেই খরস্রোতা প্রবল বন্যায় জীবন-মরণের কথা না ভেবে, জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কারণ গাছগুলো জলে ভেসে গেলে হাজার হাজার টাকা লোকসান। তাই গয়ানাথ আর অসিন্দির-এর নির্দেশে গাছ পড়ার আগে বাঘারুকে বন্যার নতুন সোঁতায় লাফিয়ে পড়ে জল মাপতে হয়। কখনও গাছটা কখন পড়বে নিশ্চিত হতে রাত তিনটেয় গাছটাকে ঠেলে দেখতে হয়। কখনো বা কুড়ুল হাতে গাছে উঠে ডাল কাটতে হয়। আর সব শেষে গয়ানাথের আদেশ—

> 'বাঘারু হে তুই যা কেনে গাছগিলার সাথত্, গাছগিলাক পাহারা দিয়া নিগি যা।' 'বাঘারু হে, গাছত উঠ কেনে। যেইঠে ঠেকি যাবু, থাকিবু। হামরালা গাছগিলাক আর তক খুঁজি নিম'

অন্ধকার জলস্রোতের মাঝখানে হারিয়ে যায় বাঘারু। লেখক বলেছেন—

> ''বাঘারু আসলে জানেই না কী করে নিজেকে বাঁচাতে হয়। পশুপাখি নিজেকে যেমন বাঁচাতে জানে তেমনিই স্বাভাবিক আত্মরক্ষার শক্তি, অথবা পশুপাখি যেমন টের পায় না তার মরণ ফাঁদ কোথায়, তেমনই স্বাভাবিক আত্মহত্যার শক্তি—এর ভেতর কোন শক্তির ওপর ভর করে বাঘারু গাছসমেত জলে ডুবে যেতে থাকে তা আন্দাজ করেও বলা মুশকিল।'' [২২]

এভাবেই যুগে যুগে কালস্রোতে ভেসে এসেছে বাঘারুরা। জীবন মরণের ফল বিশ্লেষণ না করেই। কারণ এমন কোনো ঘটনা তো বাঘারুদের নেই যা একটা কোথাও আরম্ভ হয়ে একটা কোথাও শেষ হয়। বাঘারুদের জীবনে সব ঘটনাই আগে থাকতে ঘটে আসছে, আর তার পরেও ঘটে যাবে, একইভাবে অন্তহীন প্রক্রিয়ায়। তবুও—'বাঘারুর প্রতিটি দিনই এক একটা পুরো জীবন', 'বাঘারুর ত কোনো অর্থ নেই। বাঘারু ত শুধু বাঁচা আর বাঁচা, সে ত শুধু জীবন আর জীবন'। উপন্যাসের শেষে তাই লেখককে বলতেই হয়—শেষ না করলে তো এ বৃত্তান্ত চলতেই থাকবে। গয়ানাথের জমি, গয়ানাথের চর, গয়ানাথের নদী, গয়ানাথের মহিষ, গয়ানাথের গাছের জন্য জীবনপণ করতে করতেই বাঘারু এই নদী, এই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারে। বন্যায় ভাসতে ভাসতে নদীটাকেও চিনে নিতে পারে। এর আগে তো আর গয়ানাথের গাছ নিয়ে বাঘারুকে কখনো ভাসতে হয়নি। এভাবে ভাসতে ভাসতে গয়ানাথের জন্য বাঘারুর কষ্ট হয়।

> ''মোর আর কি কষ্ট? বসি আছু, খাড়ি আছু, তিস্তার বান মোক টানি নিয়া যাছে। গয়ানাথ দেউনিয়াখানের বড় কষ্ট। ... কী আর করিবেন রে দেউনিয়া? তোমারাল গাছগিলা আর বাঘারুক ফ্যালায় ভাসি দিছেন, স্যালায় ত তুমি নিবার লাগিবে। না-হয় ত সবখানই তোমার লস।'' পুরাখান ''লস।'' এই চারিখান গাছ ''লস'', এই বাঘারুখান ''লস।'' [২৩]

বাথানের মতো এই গাছগুলোও একদিন গয়ানাথকে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাই যতদিন তাকে খুঁজে না নেওয়া হবে ততদিন এভাবেই ভাসবে বাঘারু। গাছ বুঝিয়ে দিয়ে গয়ানাথের বাঘারু আবার গয়ানাথের কাছেই ফিরে যাবে। এই ভেসে থাকাও তার ক্ষণিক মুক্তি।

নিতাইদের চরে অশ্বিনী রায়ের বাড়ির টিনের চালের উপর বাঘারু তার অস্থায়ী নোঙর বাঁধে। এখন বাঘারু জলের মাঝে ভূমির সঙ্গে সম্পর্কহীন। বাঘারু জানে জমি মানেই আল। আল মানেই মালিক, মালিক মানেই বাড়ি কিন্তু জলের কোনও মালিক নেই জলের কোনও আল নেই যদিও আল থাকলেও বাঘারুর কিছু যায় আসে না। না থাকলেও কিছু যায় আসে না। তবুও

আলহীন জল দেখতে তার খুব ভালো লাগে। ক্ষণিক মুক্তির আস্বাদের ভেতরেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার কুণ্ঠা জাগে। জল যখন নেমে যাবে গয়ানাথ তাকে খুঁজে বের করবে।—

> ''বাঘারু যেন ভেবে ফেলতে চায়—জলটাই থাকুক, সব আল-বাড়িটাড়ি-ফরেস্ট-গরুবাছুর ডোবানো এই জলটাই থাকুক, যে জলটা দিয়ে বাঘারু ভেসে এল সে-রকম জল দিয়েই বাঘারু আরো ভেসে যাক, এতই ভাসুক যে গয়ানাথ আর আসিন্দির আর তাকে খুঁজে পাবার সুযোগ পাবে না।'' [২৪]

বাঘারু উদ্ধার পর্বে পাঠক দেখে বাঘারু উদ্ধারকারী দলকে চালনা করছে বাঘারুর সমান্তরাল আর একটি চরিত্র কাদাখোয়া। বাঁধের দল বাঘারু কাদাখোয়াকে মাঝে মাঝে অভেদ ভেবে নেয়। আর কাদাখোয়া আর বাঘারুর ভেতর কোনও সংলাপের আদান প্রদান লেখক ঘটাননি। দুটি সম্পূর্ণ আলাদা সত্তা হিসাবে মেনে নিতে পাঠকেরও হয়তো ভ্রম হয়। বাঘারুর মতো কাদাখোয়ারও সেভাবে কোনও ভাষা নেই। 'কাদাখোয়া, অশ্বিনী রায় জোতদারের 'মানষি' চরের সবচেয়ে ওস্তাদ মাঝি'। কাদাখোয়াও অন্যের মানুষ, স্বতন্ত্র কোনও ব্যক্তি নয়, বাঘারুর মতোই। লেখক কাদাখোয়াকেও গাছের সঙ্গেই তুলনা করেন, জীবন্ত কোনও মানুষ বলে তাকে পাঠকেরও মনে হয় না।—

> ''তার সারা শরীরে শুধু একটা নেংটি পরনে, আর একটা গামছা, মাথার ওপর ঢাকনির মত দেয়া ... তার সারাটা শরীর এমন উলঙ্গ যে মাঝখানের নেংটিটুকুও চামড়ার সঙ্গে মিশে থাকে। মানুষের যেখানে কাপড়ের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, সেখানে কাদাখোয়ার কোনো কাপড়ের দরকার নেই। আর যেখানে মানুষের কাপড়ের কোন দরকার নেই, সেই মাথাটাকেই কাদাখোয়া গামছা দিয়ে ঢেকে প্রায় বেঁধে রেখেছে এমন করে যে চট করে দেখলে তাকে মানুষ মনে নাও হতে পারে। বন্যার সময় বাঁধের ওপর—ওরকম কাঠ, গাছ কত পড়ে থাকে।'' [২৫]

কাদাখোয়া মাথা বেঁধে না রাখলে অবশ্য উপনিবেশোত্তর সভ্যতাকেই পেছনে টেনে আনতে হয়, হিসাব মেটাতে। বাঘারুর মতো কাদাখোয়াও মনিবের আদেশ মান্য করতে সর্বদা ত্রস্ত। ঘুমের মধ্যেই দেউনিয়ার আদেশে সে যাত্রা শুরু করে। বাঘারু কাদাখোয়া দুজনেরই বৈশিষ্ট্য 'অর্থবোধহীনতা', শরীরী ভাষা বোঝায় অক্ষমতা। বাঘারু উদ্ধারের পেছনে অনেকের অনেক স্বার্থ থাকে। অফিসার, অমূল্য, নরেশ সকলের তাই বাঘারুর হাত ধরে সাধা, যা তাকে জীবনে কেউ কোনোদিন করেনি। বাঘারু কাউকে বিশ্বাস করে না কারণ তার বিরোধী শ্রেণীর মানুষের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তার অজ্ঞাত নয়। তাই তার সন্দেহ জন্মায়। বাঘারু-কাদাখোয়ার শরীর ও মনের মিলটা সকলেই একসময় আবিষ্কার করে। একশ ঊনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদে এসে বাঘারু ও কাদাখোয়ার সংবর্ধনা—'অফিসার হ্যান্ডশেকের ভঙ্গিতেই হাতটা এগিয়েছিল। কিন্তু হাতটা না বাড়ানোয় সে

বাঘারুর শরীরের পাশে ঝুলে থাকা হাতের কব্জিটা ধরে ঝাঁকায়'। বাঘারু হয়তো ভেবেছিল এ দুটো হাত কিছুতেই মিলতে পারে না। এরপর দেউনিয়া অশ্বিনী রায়ের অঙ্গুলি নির্দেশিত পথেই কাদাখোয়ার প্রস্থান ঘটে। আর বাঘারুর নামটা আর একটু বড় হয়ে যায়। গয়ানাথের গাছের বাহন হিসাবে 'গাছারু/গাছুয়া মানষি'। একশ একান্ন পরিচ্ছেদে পাঠক বাঘারুর দ্বিতীয় সংলাপের সম্মুখীন হতে পারে। নরেশ বলে 'আপনার নাম ঠিকানা কন, স্যারে জিগায়', কিন্তু বাঘারু তার চেয়ে সভ্য মানুষদের কাছে নিজের পরিচয় দিতে আর বোধহয় ভরসা পায় না। বা এটাই তার একপ্রকার বিদ্রোহের প্রকাশ। নিজেকে অস্বীকার করেই বোধহয় তার চারপাশের চলমান জগৎটাকে সে অস্বীকার করে। তাই কিছুতেই সে তার নাম বলতে পারে না—

'মোর নাম ঠিকানা নাই রো। মোর দেউনিয়া। গয়ানাথ জোতদার' বাঘারু এতক্ষণে বলতে পারে গয়ানাথের ঠিকানা সে জানে না—'লিখি দেন গয়ানাথ জোতদার'। 'সবঠেই থাকে। এইঠে আসিবে'। রংধামালির বাঁধ থেকেই হয়তো গয়ানাথ এসে একদিন তার বাঘারু নামক সম্পত্তিটিকে আবার দখল করে। বাঘারু গয়ানাথের যেমন তেমনি গয়ানাথেরই থাকবে। লেখক এর মধ্যেই জানালেন—

> বাঘারুর নাম নেই।
> বাঘারুর ভাষা নেই।
> বাঘারুর মন নেই।
> বাঘারুর মাথা নেই।

কিন্তু বাঘারুর শরীর আছে, যেমন শরীর দিয়ে সে সমস্তটা বুঝে নিতে পারে। সেই শরীরের ডাকেই একমসয় সভ্যতার ক্যামেরার লেন্সে তাকে ধরার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তার অসভ্য পরিচয়টুকু বাদ দিয়ে বাঘারুকে তাই সভ্যতার খোরাক, খবর হয়ে যেতে হয়।

বৃক্ষপর্ব শেষ, 'মিছিল পর্ব' শুরু। সেটেলমেন্টের সময়কার তিস্তা ব্যারেজ এখন নদীর মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে এসেছে। ব্যারেজের ইতিহাসের সঙ্গে বাঘারু প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পৃক্ত নয় তাই তার কোনও মিছিল নাই। কিন্তু তার দেউনিয়া গয়ানাথের তো একটা মিছিল আছে। উত্তরাখণ্ড সম্মিলনকে গয়ানাথ নিজ স্বার্থে সমর্থন করে। তাই উত্তরাখণ্ড ও শ্রীদেবীর নাচের মাঝে বাঘারুকেও এসে দাঁড়াতে হয়। 'শ্রীদেবী ও বাঘারু' সামনা সামনি

> ''বাঘারুর ঐ শালপাংশু রাজবংশী শরীরের নগ্নতার সঙ্গে মঞ্চে বম্বে ফিল্মের যৌন প্রতীক নায়িকা শ্রীদেবীর জ্যান্ত শরীরের একটা অর্থগত সংযোগ প্রতিষ্ঠা হওয়ার মুহূর্তে গানটা হঠাৎ থেমে যায় ... বাঘারু প্যান্ডেলে ঐ লক্ষ লোকের মাঝখানে তার উদোম

> শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে, পরনের নেংটিটুকু যেন থেকেও নেই। বাঘারুই যখন দৃশ্য হয়ে ওঠে, তখন অনেকে তাকে দেখেও দেখেন না। কিন্তু দেখেও না দেখে থাকার সময়টা পেরিয়ে যায়—সকলে বসে আছে যেখানে সেখানে নিজের নগ্নতা নিয়ে বাঘারু এমনই বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। যে-কোনো মুহূর্তে পরের কর্মসূচি ঘোষিত হবে, তখন বাঘারু অবান্তর হয়ে যাবে—এই সময়টাও পার হয়ে যায়। তখন শ্রীদেবীহীন মঞ্চের শূন্যতাটাও যেন বাঘারুর এই নির্লজ্জ নগ্নতায় অপমানিত হতে শুরু করে।" [২৬]

কিন্তু এ নগ্নতা কি সত্যিই বাঘারুর। মনে হয় লেখক যেন এখানে আধুনিকোত্তর সভ্যতার ভোগসর্বস্ব 'সমবেত রমণনৃত্য' বা 'নীরব শরীর মন্থন'কে ধিক্কার দিতেই বাঘারুর নগ্নতাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলেন। উত্তরাখণ্ডের দাবিতে গয়ানাথের আয়োজিত মিছিলে ঝাণ্ডাধারী বাঘারু, সঙ্গে শ্লোগান—'উত্তরখণ্ড পার্টি জিন্দাবাদ, তিস্তা ব্যারেজ বন্ধ করো, ব্যারেজ বিরোধী মিছিলে যোগ দিন'। সুস্থিরের উত্তরাখণ্ড পার্টির নিশান বহন করতে একজন জোয়ান শক্তিশালী মানুষের দরকার, এই ভিড়ের ভেতর খুঁজে পেতে সেই জোয়ান মানুষ বাঘারুই নির্বাচিত হয়। গয়ানাথের আদেশে বাঘারুই ঝাণ্ডা বাহক। কিন্তু বাঘারুর নেংটিপরা এত বড় শরীরটা দেখে সুস্থিরকে প্রথমে থামতে হয়, ভাবতে হয় মিছিলের শুরুতে বাঘারুকে কতটা মানাবে। কিন্তু ঝাণ্ডাটা বাঘারুকে দিতেই হয় কারণ বাঘারুর কোনও ঝাণ্ডা না থাকলেও তার বহন করার ক্ষমতা আছে। যা ঐ ভিড়ের ভেতর আর কারও নেই। তাই বাঘারুর হাতেই ঝাণ্ডা থাকে শুরুতেও যেমন শেষেও তেমন। বাঘারু এখন সবার আগে এমনকি তার জোতদার গয়ানাথও তার পিছনে। মনে হয় বাঘারু মিছিলের পরিচালক অথচ তার জোতদার, তার 'গিরি' 'এই বাঁশটা তার হাতে দিতেই সে মিছিলের লোক হয়ে যায়' বাঘারুকে নেতা সাজিয়ে আসল নেতারা তাকে অনুসরণের ভঙ্গিতে হাঁটতে থাকে।

> ''কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও যদি ইচ্ছে করে তাহলে যে কোনো মুহূর্তে সে বা তারা বাঘারুর আগে এসে দাঁড়াতে পারে। সেই এগিয়ে দাঁড়ানোর জন্যে তাদের এক পাও আগাতে হবে না। বাঘারুকে পেছনে চলে যেতে বললেই তারা সামনে পড়ে যাবে।" [২৭]

এটা তারা জানে বলেই বাঘারুর সামনে আসাটা ঘটে যায়। পরের একমাস বাঘারুকে এভাবেই ঝাণ্ডা হাতে মিছিলের সামনে হাঁটতে হয়। মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে পাঠকও বাঘারুর তৃতীয় সংলাপের সম্মুখীন হতে পারে। এবার বাঘারুর বিপরীতে সভ্যতার প্রতিভূ তিলক। গয়ানাথের মিছিলে লোকজন নেই কেন? জিজ্ঞাসা করে তিলক—

> 'তোমারাল মানসিলা আসিছেন না কেনে হে?'

বাঘারুর জবাব—

‘হামারালার কুনো মানষি নাই’।

‘তোমরালা কি উত্তরখণ্ডিত জয়েন দিছেন?’

‘হামরালার কুনো খণ্ড নাই, কুনো জয়েন নাই’।

‘মোর খণ্ড টণ্ড নাই, মোট পার্টি-টার্টি নাই’।

‘মোর ঝাণ্ডা নাই’

‘মুই রাজবংশী না হও’

‘মুই ভাটিয়া না হও’

বাঘারু তার নিজের সম্পর্কে এর থেকে বেশি কিছু বলতে পারে না, হয়তো বলতে চায় না, এভাবেই সে তার সমস্ত অস্তিত্বকে সময়-বিশেষে তাই অস্বীকারও করতে পারে, করতে চায় বলেই। লেখক তাই তাঁর পাঠকদের বলেছেন, প্রশ্ন করেছেন—

> ‘‘এবার বাঘারু যেন তার নিজের সম্পর্কে কিছু আরো বলতে পারে না। এখন সে শুধু বলতে পারে সে কী কী নয়, তার কী কী নেই। দশ-বার বছরে মাত্র তিন-তিনটি সংলাপ—তাও ক্রমসংক্ষেপিত! দশ-বার বছরে মাত্র তিন তিনটি সংলাপ তাও ক্রমেই নেতিবাচক। বাঘারু কি তার জীবনে ক্রমেই নিজের কাছে নিজে অবান্তর হয়ে পড়ছে—ধারাবাহিক ভাবে?’’ [২৮]

আস্তে আস্তে চলমান মিছিলটা থেকে বাঘারুও একসময় নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে। তার কাঁধে গয়ানাথের তুলে দেওয়া ঝাণ্ডাটাকে অস্বীকারও করতে পারে। তবে সবই তার নিজ চেষ্টায় সংঘটিত হয় এমন নয়, বাইরে থেকে আঘাত এসেই এসব ঘটে যায়। প্রশাসনিক আঘাত। আপলচাঁদের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বাঘারু আবার অস্তিত্বময় হয়ে ওঠে, বাঘারু আবার বাঘারু হয়ে যায় সোনার কাঠির স্পর্শে। অনুভব করে—‘আপলচাঁদ বাঘারুর, বাঘারু আপলচাঁদের’। এই ফরেস্টের ভেতরে কোথাও তার জন্ম হয়েছিল। এখানেই কোথাও বাঘ তার পিছে ও উরুতে সিল মেরে দিয়েছিল। সবাই বাঘারুর পরিচিত, বাঘারুর পৃথিবীই বলা যায় কিন্তু এখানে তিস্তার উপর তার ব্যারেজ, এ বাঘারুর চেনা দৃশ্য নয়। তিস্তার ভেতরে এক বিরাট প্রাচীরকে বাঘারু তখন আপলচাঁদের অংশ হিসাবে গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করে, ব্যারেজকে নিজের সংলগ্ন করে নিতে চায় কিন্তু ব্যারেজই বাঘারুকে বিচ্ছিন্ন করে, উৎখাত করে। মিছিল পর্ব শেষে বাঘারু সমস্যাটাকে মেলাতে চায়, পারে না। এখানে এই আপলচাঁদে বাঘারু না দেখলে গাছের বাড় আটকে যায়, কুঁড়ির ফুল হওয়া আটকে যায়, নদীর স্রোতের গতিপথ পরিবর্তন থেমে যায় অথচ বাঘারু না

দেখতেই তিস্তার উপর এমন আড়াআড়ি একটা পাহাড় পোঁতা হয়ে যায় কীভাবে সেটা দেখতেই বাঘারু উদ্বোধন মঞ্চের দিকে এগিয়ে যায়—

> ''দুপা গিয়েই বোঝে কাঁধে তার ঝাণ্ডাটা তখনো আছে। সে বাঁ হাত বাঁশটা থেকে সরিয়ে নেয় আর বাঁ কাঁধে একটা ঝাঁকি দেয়। ঝাণ্ডাটা মাটিতে পড়ে যায়, বাঁশের গোড়াটা পড়ে বাঘারুর পরবর্তী পদক্ষেপের নীচে। সেটা মাড়িয়ে বাঘারু এগিয়ে যায়। এবার বাঘারুর দুই হাত খালি, কাঁধ খালি, সারা শরীর হাল্কা। একটুকরো নেংটি ছাড়া তার আর কোন আবরণ নেই। এখানে, আপলচাঁদ, তিস্তার পাড়ে, যেমন পা ফেলতে সে আজন্ম অভ্যস্ত সেই ছন্দে তার শরীরটা দুলে ওঠে।'' [২৯]

এখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত। মুক্ত বাঘারুকে পাঠক দেখে নেয়। অন্তপর্বে এসে পাঠক বাঘারু কাদাখোয়ারই সমতলে অবস্থিত আর একটি চরিত্রকে দেখতে পায়। মাদারির মা। এদের মধ্যে সাদৃশ্য। মাদারির মাও তাদের মতোই বোধহীন, প্রকৃতি-সংলগ্ন, প্রকৃতিজীবী। উপন্যাসে দুটি নারী চরিত্র পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে। এক বাঘারুর মা যার সরাসরি উপস্থিতি উপন্যাসে নেই, বাঘারুর মুখের কাহিনিতেই জীবন্ত তার মা কুড়ানিয়া। তবে তার একটি ছবি পাঠক হয়ত কল্পনায় এঁকে নিতে পারে। বাঘারুর মতোই বাঘারুর মাও ছিল জোতদার গয়ানাথের—

> ''মোর মাওখান ত গয়ানাথেরই আছিল। কাজকাম করিত। খোয়া খাইত। আর ফরেস্টের ভিতরত গিয়া শুখা কাঠ, ডালপালা কুড়ি আনিবার লাগিত। আস্ত আস্ত ডাল। আস্ত আস্ত গাছ আনি গয়ানাথের খোলানে পাঁঞ্জা করি রাখিত। দিন নাই, রাতি নাই, কাঠ কুড়ি যাচ্ছে, কুড়ি যাচ্ছে। য্যালাই পাহাড়ের নাখান উঁচু হবার ধরিত, গয়ানাথ একখান ট্রাক ধরি আনি বেচি দিত।'' [৩০]

আপলচাঁদ জঙ্গলের কোনও একটি স্থানে প্রসব-বেদনায় কাতর কুড়ানি বাঘারুর জন্ম দেয়। বাঘারু তার মায়ের প্রসবদৃশ্যকে তুলে ধরে সভ্য এম-এল-এর চোখের সামনে। যেন এম-এল-এ-র মতোই পাঠকও দৃশ্যটা দেখতে থাকে। এক মানবী মা, মানবী প্রকৃতি একা একাই জন্ম দিচ্ছে একটা মানব শরীরের। সভ্যতার কিছু মাত্র স্পর্শ লাগেনি সে-প্রক্রিয়ায়, যেন বন্য পশু। এরকমই আর একটি জন্ম-দৃশ্যকে লেখক অঙ্কন করেছেন। এক মহিষানি জন্ম দিচ্ছে তার সন্তানের, সূর্যে গ্রহণ লেগেছে, অতি শীঘ্র আঁধার নামবে বিশ্বচরাচরে। এক অপার্থিব দৃশ্য যেন, এ পৃথিবী থেকে বহু দূরে ঘটে চলেছে যেন। পশুজননীর সহায়তা করে আর এক পশু-মানব যার জন্মবৃত্তান্তও একই ছন্দে একই সূত্রে গ্রথিত। মহিষানীও গয়ানাথের আর বাঘারুর মাও গয়ানাথেরই সম্পত্তি। বাঘারুর টানে মহিষ শাবক তার অন্ধকার জগৎ ঠেলে আলোর জগতে প্রত্যাবর্তন করে, জন্ম নেয় আর একটি নতুন জীবন। নতুন জীবনের প্রত্যাশী বাঘারুই পারে সে-প্রাণকে রক্ষা করতে—

> ''পেটের ভেতরের আস্ত একখান বাছুর জলে রক্তে ভিজি বাহির হয়্যা আসি দুই ঠ্যাঙত খাড়া হবার পারে', সেই মুহূর্তে আকাশে, লক্ষ লক্ষ গ্রহ নক্ষত্রের অসংখ্য আকর্ষণ-বিকর্ষণে তৈরি অগণন কক্ষপথের সাপেক্ষতায় সূর্যের যে আঁধারপাত ঘটে যাচ্ছিল সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশের নির্ভুল মাপে, বাঘারুর হাতের মাপ ছিল তার চাইতেও নির্ভুল।" [৩১]

মহিষ-জননীর সন্তানের সঙ্গে নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করে দেয় বাঘারু, 'তারপর নাড়ীটা ছিঁড়ে একটা গিঁট দিয়ে বাঘারু বাছুরটাকে আলাদা করে ফেলে'। বাঘারুর নিজের নামের প্রসারতার সঙ্গেই জুড়ে আছে তার ছিন্ন নাড়ীর সম্পর্ক। 'কুড়ানিয়ার ছোঁয়া' থেকে 'কুড়ালিয়া কাটা' হয়ে যায় এই সূত্রেই। যখন উন্নত সভ্যতার অগ্রগতির পথে এক মানবী মাকে দেখা যায় কুড়াল হাতে নিয়ে নিজের সঙ্গে সন্তানের নাড়ীর সংযোগ ছিন্ন করতে। এ সকল চরিত্র, আর ঘটনাবলীর উপস্থিতি, বাংলা উপন্যাসের তখনও অবধি প্রাপ্তি ছিল, যা সেই মুহূর্তে ঘটে গেল।

আর এক মা কে আমরা দেখতে পাব উপন্যাসের প্রায় শেষের দিকে, তবে উপন্যাস পাঠের পর মনে হয় সমগ্রটা জুড়েই তো ছিল মাদারি, মাদারির মায়ের বাঁচার ইতিহাস-ভূগোল। বাঘারুর মতোই 'না-মানুষের'ই পর্যায়ভুক্ত মাদারি আর মাদারির মায়ের যেন একটি স্বতন্ত্র জগৎ কোথাও আছে আমাদের না দেখার, না দেখতে চাওয়ায় ভেতরই। যাকে লেখক বলেছেন 'মাদারির মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র'। ফরেস্টের সীমানায় ন্যাশনাল হাইওয়ের পরে, 'যে ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপর দিয়ে এই ভারতবর্ষের কোনো এক রাজ্য থেকে আর-এক রাজ্যে মাল নিয়ে দিনরাত ট্রাক চলে'। ঝোরার ভেতর থেকে ওঠা একটা শ্যাওড়া গাছের তলায় বাস মাদারি আর মাদারির মায়ের। ডালপাতা দিয়ে ছাওয়া ঘরের পরিচয়েই স্থানটি পরিচিত হয় শেওড়াঝোরা বলে। মাদারির মায়ের জীবনের কোনো শুরু নেই যেমন নেই কোনও সমাপ্তি। লেখক বলেছেন—'মাদারির মা তখন কোথায় ছিল সেটা মাদারির মা-ই জানে না'। 'এমন একটা ফরেস্টের কিনারায়, শ্যাওড়া গাছটার মতোই, মাদারির মা কেন থাকে, তার কোনো ইতিহাস নেই। আর-কোথাও থাকার জায়গা নেই, তাই থাকে'। ন্যাশনাল হাইওয়েতে এই শ্যাওড়াঝোরাতে যখন ট্রাক থামে মাদারি অপটু হাতে সেই ট্রাক মোছার কাজ করে দেয় বিনিময়ে যা পায়। 'ধীরে ধীরে, মাদারি এই কাজটা প্রায় আদায় করে নিয়েছে'। আর ঘোষমশাইয়ের দোকানে মাদারি দুই হাটবারে দরকারের সময় কাপডিশ ধুয়ে দেয়। দু এক সময় চাও দেয়। ঘোষমশাই বিনিয়ে দু-চার পয়সা দেন। চা বানানো শিখে স্বাবলম্বী হতেই সে চায় কিন্তু চা বানানোর টেবিলটা এখন তো তার থুতনি পর্যন্ত আসে না। মাদারির মা জানে চা বানাতে শিখলেই মাদারিও তার পূর্বের আট দশটি সন্তানের মতোই তাকে ছেড়ে চলে যাবে। মাদারির মা এখন আট দশ বছর মাদারির মা। তার আগে সে আরো অনেকের মা হয়েছে, কতবার সে-হিসাব তার কাছেও খুব একটা স্পষ্ট নয়।—

> ‘‘কিন্তু মাদারির মা-র সব সময়ই একটা ছেলে দরকার। একটা প্রমাণ সাইজের পুরুষমানুষ তার সব সময় দরকার কী না সেটা কখনোই তার মনে আসেনি। কিন্তু একটা ছেলে তার নেহাতই প্রয়োজন। আর মায়ের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এমন ছেলে ছাড়া কে তার সঙ্গে থাকবে? মাদারির মায়ের একটা মাপ আছে। সে জানে ঐ মোটামুটি যখন চায়ের দোকানের টেবিলের সমান মাথা হয়, বা নিজে ট্রাকের চাকার ওপর ভর দিয়ে ট্রাকের পেছনে উঠতে পারে, বা যা পয়সা পায় তার মাকে আর দেয় না তার কিছুদিনের মধ্যেই সে-ছেলে শ্যাওড়াঝোরা ছেড়ে চলে যায়।’’ [৩২]

কিন্তু একজন ছেলে ছাড়া তো মাদারির মার জীবন অচল, ‘তাই এক ছেলে লম্বা হওয়া শুরু করতেই সে আর-এক ছেলে আনে, যাতে আগের ছেলে খাবার খুঁজে বেড়ানো বা ঝোরায় আচমকা দাঁড়ানো ট্রাকের কাছে হাত পেতে দাঁড়ানো বন্ধ করার সঙ্গে-সঙ্গেই পরের ছেলে একটা বয়সে পৌঁছে যেতে পারে, এভাবে হিসাব নিকাশ করেই তাকে সন্তান আনতে হয়। সন্তান সে ‘আনে’ কোনও সামাজিক শৃংখল ছাড়াই। কিন্তু তার জন্য সন্তানের বাবার প্রয়োজন। সে-ইতিহাসও লেখক জানিয়েছেন কিন্তু এতে মাদারির মায়ের জীবনে কোনও ক্লেদ নেই কারণ যেখানে খাদ্য উপার্জনের জন্যই সন্তান ধারণটা জরুরি, সেই রুজির প্রশ্নে সভ্যতার শৃংখল জড়ানো সহজ নয়। লেখক বলে চলেছেন মাদারির মায়ের ক্রমান্বয়ে মা হয়ে যাওয়ার কাহিনি, আর আমরা পাঠকেরা সে-কাহিনিকে শুনে যায় নিস্পৃহ নিরাসক্ত ভাবে। সভ্যতার নিয়ম থেকে মুক্ত অন্য পৃথিবীর গল্প। লেখক প্রশ্ন তোলেন এ হেন মাদারির মা—তিস্তা ব্যারেজের ‘জুলুমে’ যাবে কেন? সে তো বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপ তার সঙ্গে তো ব্যারেজের বা নদীর কোনও সম্পর্ক নেই। খাবার সংগ্রহ করতে করতে সারাদিন ফরেস্টের ভেতরে ভেতরে ঘুরে বেড়াতে হয় তাকে। এটাই ত তার সারাদিনের কাজ। হাতে একটা শক্ত লাঠি থাকে যখন খুব খিদে পায় লাঠিটাকে ভার মনে হয় তার। এইসব বনবাদাড়ের ভেতরই কিছু চট করে পেয়ে যাওয়ায় আশায় থাকে—বনমুরগির ডিম, বা বনমুরগির ডিম থেকে বেরোনো অথচ দৌড়তে না শেখা ছোট ছানাই গোটা একটা, মেটে ইঁদুরের সদ্য জন্মান ছোট ছোট বাচ্চাও জুটে যেতে পারে। সুতরাং বনবাদাড়ের ভেতর না ঢুকে মাদারির মায়ের কোনও উপায় নেই। যেমন করে বনের পশু খাদ্য সংগ্রহ করে ঠিক তেমন করেই ‘এই ফরেস্টে এই শ্যাওরাঝোরায় তাকে প্রতিদিন, প্রতিটি দিন, নিজের খাবার জোগাড়ে বেরতে হয়—যেভাবে ফরেস্টের মুরগি বেরয়, পাখি বেরয়, বড় বড় জীবজন্তু।’ পশুদের জন্য বরাদ্দ লবণ জঙ্গল থেকে সে পেয়ে যায় আর পায় জ্বালানি কিন্তু আগুনের বড় অভাব। অদ্ভুত পদ্ধতিতে মাদারি ও তার মাকে আগুন বহন করে আনতে হয় হাটের চা দোকান থেকে। চাল কেনা যত সহজ তার কাছে আগুন কেনা তত সহজ নয়। একটা আস্ত দেশলাই একটা আগ্নেয়গিরির সমান। বাঘারু-কাদাখোয়ার মতোই মাদারির মায়ের সাদৃশ্য প্রসঙ্গে লেখক গাছের কথায়ই বলেন—

‘ফরেস্টের ঐ আবছায়ায়—শাল-সেগুন-খয়ের-অর্জুনের পরিপ্রেক্ষিতে মাদারির মাও যেন একটা গাছই হয়ে ওঠে’। আবার জঙ্গলের মধ্যে সে ‘মুরগীর মত সাবধানী, গুঁই সাপের মত নিভৃতচারী, গোখরোর মত কালান্তক’। কিন্তু মানুষের সমাজে সে বড় বেমানান। কামতাপুর, উত্তরখণ্ড, নমশূদ্র সমিতি, গোর্খাল্যাণ্ড কোনও কিছুরই সঙ্গে মাদারির মায়ের কোনও সংযোগ নেই, তবুও সে জলুশে যায়। কারণ আর সকল মানুষ যে-কারণে এই সব ইতিহাস-ভূগোলের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে সেই একই কারণে মাদারির মাও এই জলুশের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। মাদারি হাট থেকে জলুশের খবর শুনে এসেছে। জলুশে লোক দরকার, লোক বাড়ানো দরকার, তবে মাদারির মাকে কারও দরকার নেই,—

> ‘‘এই এত এত বাড়ি-টাড়ির মধ্যে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই জোগাড় করার ক্ষমতা যার নেই, এই এত ঘন এত বড় ফরেস্টের মধ্যে কোনো এক জায়গায় কোনো ঝোরার পাশে থাকে একটা শ্যাওড়াঝোরা বানাতে হয় তার কোন জলুশ থাকে না। একদিন জলুশে যাবার অর্থ ত তার কাছে একটি দিন না-খেয়ে থাকা। একটি দিন না খেতে পাওয়া বা না-খেয়ে থাকা মাদারির মায়ের কাছে কোন অদ্ভুত ব্যাপার নয়। এমনও নয় যে সে তার একটা পুরা দিন নষ্ট হওয়াটা মাপতে পারে হাজিরা কত নষ্ট হল তার হিসেব দিয়ে। পেটের খিদে বা শ্রমের পয়সা—এর কোনটাই মাদারির মায়ের দিন যাপনের মাপ নয়’’

তাহলেও তাকে জলুশে যেতে হয় কারণ মা না গেলেও মাদারি যাবে জলুশে। তাহলে মাদারি তার মায়ের কাছ থেকেই প্রথম জেনে যাবে ‘এখন মা ছাড়া জুলুশে, এত বড় জুলুশে যেতে পারে’। মাদারির মায়ের হিসাবে গোলমাল হয়ে গেছে একটা ছেলে পেটে না আসতেই এই ছেলেটা চলে যাবার মতো লম্বা হয়ে গেছে। এত সব কিছুর হিসাব নিকাশ করে যে মাদারির মাও চলতে পারে এমন নয়। ভাবনাগুলো আলগা ভাবে তার মাথা ও মনের চারপাশে কেবল জমা হয়ে থাকে মাত্র। মাদারির মাকে তাই যেতে হয়। কিন্তু কোথায় যেতে হবে তার সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই, মাদারিকে বলতে হয় ‘তুই চিনিস?’

‘মুই ক্যানং করি চিনিম? সাই তিস্তা নদীর মুখত, বান্ধ বান্ধিবার তানে সব মন্ত্রী মানষিলা আসিবে’ এটাই তাদের জুলুশ। মানুষের সমাবেশে মাদারির মা কেবল মানুষের গন্ধ শোঁকে, আওয়াজ শোনে, সে তো বিচ্ছিন্ন জগতের বাসিন্দা, মানুষের গন্ধ আর শব্দ তাই তার থেকে বহু দূরের জিনিস—‘এই এত লোক, এত ট্রাক, এত মিছিল, এত আওয়াজ, এত কথা—এর ত কোনো মানেই নেই তার কাছে’ তবু তার ভালো লাগে, মানুষের গন্ধ তার ভালো লাগে কারণ ফরেস্টের গন্ধটা তো তাকে কোনোদিনই ছাড়ে না। মাদারির মা তো মানুষের গন্ধ পায় না। মানুষের সঙ্গের কামনা থাকে তার অন্তরে সর্বদা। এখানে মানুষের গন্ধ থেকে আওয়াজ থেকে সে মানুষের সঙ্গ পায়।—

''যে মানুষের কাছ থেকে তার দৈনন্দিনের আহার জোটে না বলেই সে ফরেস্টে গিয়ে গাছপালা পশুপাখি কীটপতঙ্গ আর নদীঝোরার সঙ্গে থাকে, সেই মানুষেরই গায়ের গন্ধ তাকে এক মুক্তির স্বাদ দেয়।"

এখানে ফরেস্টের সেই আচ্ছন্নকারী শব্দ থেকে সে মুক্ত। সমবেত মানবিক স্বর তার মনে স্বপ্ন দেখার মতো বিভ্রম জাগায়। ট্রাকে মাদারির মা ব্যাজ পায়, টিফিনও পায়, সভ্য মানুষের খাদ্যের আস্বাদ পায়—'কয়েক সহস্রাব্দ পর মাদারির মা জিভ দিয়ে জানে—পৃথিবীতে স্বাদের বৈচিত্র্য কতটাই'। তখনই তার সামনে প্রতিভাত হয় মানুষের সৃষ্টি তিস্তা ব্যারেজ। মাদারির মা ভিড়ে মিশে নিজের পূর্বের সন্তানদের অনুসন্ধান করে যারা হারিয়ে গেছে যদি তাদের দেখতে পায়। এর ফলেই সে তার বর্তমান সন্তান মাদারির থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে লেখক অন্তপর্বের শেষ অধ্যায়ে মাদারির মাকে স্বরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করিয়েছেন কিন্তু মাদারিকে লেখক ফিরে পাঠান না কারণ বাঘারু আর মাদারিকে লেখকের প্রয়োজন এ বৃত্তান্ত শেষের পরেও আর এক শুরুর কথা বলার জন্য। কিন্তু মাদারির মায়ের বৃত্তান্ত শেষ করতে হয়।—

'শেষ না করলে ত এ বৃত্তান্ত চলতেই থাকবে—পরদিন, তার পরদিন, তার পরদিন'।

এ জীবন তো অনন্ত, এ জীবনের তো শেষ নেই,'

লেখক যেমন বলেছেন—

'এখানে জীবনের পর জীবন বাঁচে'।

'মাদারির মা ভারতবর্ষের প্রায় আশি কোটি মানুষের মধ্যে সেই ছ-সাত কোটির একজন যারা বনের পশুর নিয়মে বাঁচে। 'দারিদ্র্যসীমা' 'পশ্চাদপদ আংশ' ইত্যাদি ইত্যাদি শব্দ তাকে ছোঁয় না'।

এই জীবনকেই লেখক ধরে রাখতে চাইলেন তাঁর এই বৃত্তান্তের মধ্যে, তিস্তাপারের বৃত্তান্তের মধ্যে 'মাদারির মায়ের প্রতিদিনের বাঁচাই এক স্বাধীন, সার্বভৌম স্বরাট্, স্বাবলম্বী বাঁচা। সেই বাঁচা, দিনের পর দিন বেঁচে থাকা নয় মাত্র, প্রতিটি দিনই একটা পুরো জীবন বাঁচা, একটা গোটা মানবজীবন বাঁচা'। তবে তার বাঁচার মধ্যে সভ্যতার কোনও গৌরব নেই আছে অপমান। আর এদের জীবনকে কাগজে কলমে ধরে রাখতে হলে লেখককেও সময়ে সময়ে মিথ্যার সাহায্য নিতে হয়ই কারণ—'সেই অপমানের বিচ্ছিন্নতাকে বিদ্রোহের বিচ্ছিন্নতা বলে ভাববার মধ্যে, তার সাতকাহন বৃত্তান্ত রচনার মধ্যে মিথ্যা কিছু থেকেই যায়'। ঔপন্যাসিক জানালেন—

''ভারতবর্ষে যারা কালি-কলম ব্যবহার করতে জানে, আমাদের মত, তারা জানে না

ভারতবর্ষের দরিদ্রতম ছ-সাত কোটির কথা কোন অক্ষরে লেখা যায়। তাই অক্ষরজ্ঞানহীন এই বৃত্তান্ত যত লেখা হবে, ততই মিথ্যা হবে।"

এই স্বকীর্তির গৌরবেই লেখকের লেখক হয়ে ওঠা। এ অপমানের জ্বালা-যন্ত্রণাকে আপন অন্তর দিয়ে অনুভব করা আর তাকে পেরিয়ে আসা। নতুন জগতের অন্বেষণ করা। এই সমস্যাকে মাথায় রেখেই 'এই বৃত্তান্ত রচনার যুক্তি ও বৃত্তান্ত সমাপ্তির কারণ' বিশ্লেষণ করা। পরিশিষ্টে লেখক বলেছেন—'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত শেষ হয়ে গেছে'। সকলকেই তিনি নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন জীবনে কম বেশি বদল ঘটিয়ে। 'তিস্তা ব্যারেজের পর তিস্তার প্রাকৃতিক জীবন শেষ, এখন সে এক মানবিক নদী'। এই মানবিক নদীকে দেখতেই প্রাকৃতিক বাঘারু এগিয়ে এসেছিল তিস্তা নদীর ব্যারেজ, ফরেস্ট ও তার ভেতরকার মিলটা বুঝে নিতে। 'গয়ানাথের ঝাণ্ডা কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফেলে দিয়ে সে গটগটিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিল ঐ ব্যারেজ আর মঞ্চের দিকে'। তখন পথ পায়নি বলে এতক্ষণ ঘুমোল, এখন পথ পেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করেছে। বাঘারুদের এরকম ঘুরপথেই বারবার আসতে হয়েছে না হলে গয়ানাথ কেমন করে তাকে দিয়ে ডোবাজমি মাপাত, তিস্তায় ভাসা গাছ ডাঙায় তুলত। মিছিলহীন বাঘারু তাই পথ খোঁজে মিছিলে মিশে যাওয়ার জন্য নয়, মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনভাবে মুক্ত জীবনে বাঁচার জন্য। একসময় হেঁটে সে পৌঁছেও যায় মঞ্চের কাছে—'নো ম্যানস ল্যাণ্ড'—এ আর তখনই সে তার দোসর পেয়ে যায়। মাদারি, মিছিলহারা তার মতনই স্বতন্ত্র একটি মানব সন্তান, একটি কিশোরকে।—''বাঘারু হাতদুটো মাদারির মাথায় চুলের ওপর রাখে আর মাদারি এই মিছিলহীন ও নদীজীবন সর্বস্বহারা মানুষটিকে মমতায় আরও জড়িয়ে ধরে। তারপর আধা কৌতুকে জিজ্ঞাসা করে 'তোমরালা কি মোর নাখান হারি (হারিয়ে) গিছেন'। এ বৃত্তান্তকে লেখক এর পরেই শেষ করতে চাইলেন যেন বাঘারু মাদারি আকাশ পথে যাত্রা করে। বাঘারুর সম্পূর্ণ নির্বাসন ঘটে গেল কিন্তু তার আগে লেখক আরও কিছু না বলতে পারা কথা বলে নিলেন।

''বাঘারু তিস্তাপার ও আপলচাঁদ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মাদারিও তার সঙ্গে যাচ্ছে। যে কারণে তিস্তাপার ও আপলচাঁদের শালবন উৎপাটিত হবে—সেই কারণেই বাঘারু উৎপাটিত হয়ে গেল। যে কারণে তিস্তাপার ও আপলচাঁদের হরিণের দল, হাতির পাল, পাখির ঝাঁক সাপখোপ চলে যাবে—সেই কারণেই বাঘারু চলে যায়। তার ত শুধু একটা শরীর আছে। সেই শরীর এই নতুন তিস্তাপারে, নতুন ফরেস্টে বাঁচবে না। এই নদী বন্ধন। এই ব্যারেজ, দেশের অর্থনীতি বদলে দেবে, উৎপাদন বাড়াবে। বাঘারুর কোন অর্থনীতি নেই, বাঘারুর কোন উৎপাদনই নেই। বাঘারু এই ব্যারেজকে, এই অর্থনীতি ও এই উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করল। বাঘারু কিছু কিছু কথা বলতে পারে বটে কিন্তু প্রত্যাখ্যানের ভাষা তার জানা নেই। তার একটা শরীর আছে। সেই শরীর দিয়ে সে প্রত্যাখ্যান করল।

সে এখন সারারাত ধরে এই ফরেস্ট পেরবে—যেখানে সে জন্মেছিল, দুটো একটা রাস্তাও পেরবে ... তারা দুজন দুজনের পক্ষে কত অপরিহার্য হয়ে উঠবে। সে ত আর এক স্বতন্ত্র বৃত্তান্ত।

এ-বৃত্তান্ত এখানে শেষ হোক।

এই প্রত্যাখ্যানের রাত ধরে বাঘারু মাদারিকে নিয়ে হাঁটুক, হাঁটুক, হাঁটুক...," [৩৩]

বাঘারুর প্রান্তিকায়িত অসমাপ্ত কাহিনি এভাবেই কাহিনির পর কাহিনি হয়ে চলতেই থাকবে হয়তো।

মাটির অ্যান্টেনা : আবহমান গ্রামবাংলার গল্প

দেবেশ রায়ের পর সাধন চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন শক্তিশালী গদ্যকারের খুবই প্রয়োজন ছিল বাংলা কথাসাহিত্যে। সাধন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন

"সত্তরের দশক তো এদেশে বসন্তের বজ্র-নির্ঘোষ হিসেবে পরিচিত, খুনোখুনি, জেল ভাঙা, গুপ্তহত্যা, জরুরি অবস্থা, সংগ্রাম গণতান্ত্রিক আন্দোলন—এমন প্যান্ডোরা-বাক্স বাঙালির সমাজ-জীবনে পূর্বাপর দৃষ্টান্তরহিত। মানুষ তো নিজের মধ্যেই দৃষ্টি, চোখের জন্ম দিচ্ছিল নিঃশব্দে।" [৩৪]

এরই মধ্যে তিনি লিখে চলেছেন 'গহীন গাঙ' (১৯৭৮-৭৯), 'জল তিমির' (১৯৯৭)-এর মতো উপন্যাস। এরপর 'মাটির অ্যান্টেনা' (২০০০)-য় তিনি জনবিশ্বাস, প্রবাদ, মিথ, লোককাহিনির অতীন্দ্রিয় পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। 'কেন উপন্যাস লিখি' প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন

"ততদিনে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, নারী আন্দোলন, রাজনীতিতে মার্কসিজম্-এর ধারণা নিয়ে বিশ্বব্যাপী নানা বিতর্ক শুরু। সোভিয়েত দেশের পতনের মধ্য দিয়ে বিতর্কের প্যান্ডোরা বাক্স খুল গেছলো। বুঝলাম উপন্যাসের আখ্যানকে আরও শক্ত হতে এ সবের মুখোমুখি হতে হবে।"

'মাটির অ্যান্টেনা' (২০০০) উপন্যাস প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—'মাটির অ্যান্টেনা লিখেছিলাম পঞ্চায়েত প্রশাসনে মহিলা সদস্যদের ভূমিকা নিয়ে।' বিষয়টি আমাদের রাজনৈতিক প্রান্তিকতার আর এক দিক। নিম্নবর্গ বিচারের নিরিখে নারীসমাজও ব্রাত্য। একথা আমরা জানি। যে বর্গ বর্ণ নির্বিশেষে পিতৃতান্ত্রিক খাঁচায় রুদ্ধ নারীসমাজও নিম্নবর্গের পরিবারভুক্ত। লেখক উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন 'আবহমান গ্রামবাংলার নতুন যুগের জনয়িত্রীদের'। মাটির অ্যান্টেনা

উপন্যাসে আমরা দেখলাম, একদিকে পঞ্চায়েত ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে তহমিনার স্থানচ্যুতি, অন্যদিকে পরিবার জীবন ও স্বপ্ন থেকে টুনির স্থানচ্যুতি। আর দেখলাম 'একদিকে লাঞ্ছিত নারীজীবন, অন্যদিকে অত্যাধুনিক বিকৃত নারীবাদ—এই দুয়ের মাঝে নতুন গ্রামবাংলা বিপর্যস্ত দিশাহীন', এদিক থেকে উপন্যাসটিকে বলা যায়—'প্রান্তিক সংস্কৃতির নবরূপায়ন'।

উত্তর-ঔপনিবেশিক নগর-সভ্যতায় আমরা দেখতে পাই কেন্দ্র থেকে প্রান্তিকেরা ক্রমশ মুছে যাচ্ছে। ফলে যতদিন যাচ্ছে কেন্দ্র আর প্রান্তিকের ব্যবধান আরও আরও দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। উপন্যাসে—গেঁড়িবুড়ি, দুকড়ি বালা, তাপসীর দিদিমা প্রমুখ সকলের মধ্যে লেখক দেখিয়েছেন লোলচর্মের ভুরুচালসে প্রান্তিক ভারতবর্ষকে। ঔপন্যাসিক তহমিনার আন্তরিকতার সঙ্গে শিকড় ধরে নেমে গেছেন মাটি-সংলগ্ন প্রান্তিক জীবনের মধ্যে। আমাদের দেখিয়েছেন বাণিজ্য জগতের বাস্তবতা এবং প্রান্তিক জগতের বাস্তবতা কতখানি বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। কেন্দ্র সমাজের নারীরা যখন সৌন্দর্য চর্চায় বিজ্ঞাপনী নারী হয়ে উঠছে তখন প্রান্তিক সমাজে টুনিদের অবস্থান আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তৃতীয় বিশ্বের শাশ্বত যন্ত্রণা ভোগের মারাত্মক জখমের চিহ্নগুলি।

'মাটির অ্যান্টেনা' উপন্যাসে তৃতীয় বিশ্বের অন্তঃস্বর হিসেবে অন্ত্যজ শ্রেণির উপস্থিতি, নারী জাতির সামাজিক অভিঘাত চরম রূপ পেয়েছে। যুগ বদলেছে, সময় বদলেছে কিন্তু আমাদের প্রান্তিক সমাজ-ব্যবস্থার মূলে তেমন কোনও পরিবর্তন আসেনি। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের বেশির ভাগ আখ্যানেই আছে প্রান্তিক ব্রাত্য জীবনের বিপর্যয় আর তাদের ঘুরে দাঁড়াবার কথা। লেখক জীবনের শুরু থেকেই সাধন চট্টোপাধ্যায় পুরো মাত্রায় দায়বদ্ধ লেখক। লেখক বলেছেন

> ''দায়বদ্ধ লেখকেরা নানান পত্রপত্রিকায় বেশ কিছু ভালো লেখা লিখে চলেছেন। পাঠকের মনে সন্দর্ভ তৈরীর পর মনে হয় এই হচ্ছে আমাদের তৃতীয় বিশ্বের বাস্তব''[৩৫]

তৃতীয় বিশ্বের এক বাস্তব কাহিনি হিসাবে আমরা মাটির অ্যান্টেনা উপন্যাসের কাহিনিকে ধরে নিতেই পারি, কারণ লেখক সে-দায় স্বীকার করে নিয়েছেন। উপন্যাসে দেখি এই বাস্তবের চাপে সমাজের নীচের অংশটা যেন সময়ভেদী তাড়নায় অনেকখানি নড়ে-চড়ে উঠেছে। সমালোচক বলেছেন

> ''বাংলা উপন্যাস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দরিদ্রসীমার নীচে থাকা নারীদের নিয়ে ভাবিত হয়নি। এইসব প্রান্তিক নারীরা আজও গ্রামীণ অর্থনৈতিক দুরবস্থার মাঝে একইভাবে নিঝুম হয়েই আছে শৌখিনতা জানে না তারা; বাস্তব সংসারের অজস্র গর্ত থেকে

> একটার পর একটা প্রয়োজনের ইঁদুর বার হয়ে এসে দংশন করছে এদের অস্বাস্থ্যের যৌবনকে। গোটা পৃথিবীতে সুকৌশলী বাণিজ্য জগৎ যখন তথাকথিত শিক্ষিতা নারীদের একটা মডেল-সর্বস্ব আত্মপ্রকাশের রুচি গড়ে দিচ্ছে। রুচির অধিকার প্রতিষ্ঠার নাম করে যখন তাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হচ্ছে দুরারোগ্য আকাঙ্ক্ষা—তখন গ্রামের আনাচে কানাচে প্রান্তিক নারীদের ওপর দিয়ে একের পর এক বয়ে চলেছে অধিকার হরণের অন্যায় ঝড়।" [৩৬]

উপন্যাসে প্রান্তিক সংস্কৃতির প্রকৃত কথা বলতে গিয়ে লেখক ছদ্ম-মমত্ব, আরোপিত বিদ্রোহের কষ্টকল্পনা এড়িয়ে নিম্নবর্গীয় জীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন। মাটির অ্যান্টেনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—

> ''এ উপন্যাস আমি লিখেছি নয়ের দশকে শেষলগ্নে। তখন গণমাধ্যমে, রুচি, গ্রামীণ সমাজের নতুন ভাঙচুরের মধ্যে তহমিনার Super Structure-এ তথাকথিত মধ্যবিত্তের চাহিদা প্রত্যাশার কিছু চাপ পড়তে বাধ্য। এখন তো মধ্যযুগের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি নয়, 'বাজার' বা মার্কেট-এর বদল চরিত্রে দেশের দূরতম সমাজ একটি সূত্রে গাঁথা। সময়ের দাবীতেই তহমিনার ঘরে টি.ভি., সংবাদপত্র এবং সাক্ষরতার আকাঙ্ক্ষা থাকাটাই স্বাভাবিক।" [৩৭]

'মাটির অ্যান্টেনা' উপন্যাসে লেখক বর্গা অপারেশনের পরবর্তী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বয়ন করেছেন নিম্নবর্গের জীবন-অভিক্ষেপ। তহমিনা যখন পরিবারের সামান্য গৃহবধূ থেকে পঞ্চায়েতের 'বিচারসালিশ'-এর দায়িত্ব নিল, যখন সে গোঁড়ামি ও সংস্কার ভেঙে নারী ও ব্রাত্য জীবনে নতুন সত্য আনার চেষ্টা শুরু করল তখনই সে অনুধাবন করল পঞ্চায়েতে পুরুষ ও নারীদের অধিকার সমান নয়। উচ্চবর্গ আর নিম্নবর্গের সদস্যদের ক্ষমতা এক নয় পঞ্চায়েতে। মহিলা আসন সংরক্ষণ হয়েছে ঠিক কথা কিন্তু কর্তৃত্ব ও দাপট এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়ে গেছে উচ্চবর্ণের পুরুষদের দখলে। তারা যতটা সুতো দয়া করে ছাড়বে তহমিনারা ততটাই দূরে যেতে পারবে, ততটাই স্বাধীনতা পাবে। অথচ পঞ্চায়েতে কিন্তু নিম্নবর্গের জন্য নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ হয়ে গেছে। সাধন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> ''গত ১৫ বছরে গ্রাম বাংলার সমাজ পরিবার মানুষের চেতনা চৈতন্য গুণগতভাবেই বদলে গেছে। মানিক- তারাশঙ্কর বা বিভূতিবাবুদের গ্রাম পনেরো আনাই নিশ্চিহ্ন। নতুনকালের, নতুন পরিস্থিতির গ্রাম-সমাজ এবং রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের সুফল-কুফল নিয়ে স্বভাবতই দুই বিপরীত মেরুর মত আছে, উভয়ের যুক্তিতে আংশিক সত্য যে নেই বলা যাবে না।"

সাক্ষরতা প্রকল্পে কাজ করার অভিজ্ঞতা তহমিনাকে অন্য ধরনের আনন্দ দিয়েছে। সে তার শিক্ষা-চেতনা দিয়ে একথা বুঝেছে যে নারীজীবনের মূল থেকে সংস্কারগুলো দূর করার জন্য সাক্ষরতা ভীষণ জরুরি। একাজে পঞ্চায়েতের প্রধান নেতাদের সে সবসময় পায় না। কারণ এ কাজের চেয়ে রাস্তা তৈরি, উন্নয়নের কাজে তাদের বেশি ঝোঁক কারণ একাজের ফল হাতে নাতে পাওয়া যায়, অথচ সাক্ষরতা বিকাশ করে চেতনা সঞ্চারের ফল খুব দ্রুত পাওয়া যায় না। সাক্ষরতা প্রকল্প অর্থাৎ শিক্ষা চেতনার প্রসারমূলক কাজে তহমিনাকে সাহায্য করে টুনি ধাঙ্গিদের মতো চরিত্র, যারা নিম্নবর্গ সমাজের আর এক বাস্তব। তারা গাছের মতো সর্বংসহা, টুনির কাহিনিতে সমাজের বুক চিরে 'অপর'জনদের রক্ত নীরবে প্রবাহিত হয়েছে।

'তহমিনা এই আখ্যানের বর্তমান প্রান্তিক নারীসমাজের প্রতিনিধি যে অতীত ও ভবিষ্যতের নারী ও প্রান্তিক সমাজের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করছে। সেই সংযোগ থেকে সে বুঝতে পারে সেকালের নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রতিনিধিদের, নারীদের তখনই তৃপ্তি দেওয়া যাবে যখন একালের অন্তেবাসী জনসমাজ নিজের পায়ে শক্তভাবে দাঁড়াতে পারবে। সেরকম একটা উপলব্ধির স্তরে পৌঁছে দেখতে পায় দেশ-কালের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে খোলস ত্যাগ করতে চাইছে প্রান্তিক জনসমাজ। তারাও শিক্ষা চাইছে, নিজেরা বুঝতে চাইছে প্রতিষ্ঠা চাইছে।' কিন্তু মনুষ্য সমাজে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অর্থ-রাজনীতির ছোটবড় ভেদ গড়ে তুলে রাষ্ট্র ও সমাজের যাবতীয় সুযোগ সুবিধাগুলো থেকে প্রান্তকে বঞ্চিত করে নিজের দিকে নির্লজ্জভাবে টেনে নিতে গুণবিশিষ্ট কেন্দ্র কখনও এতটুকু পিছপা হয়নি।

> ''এর ফলে আহত হয়েছে প্রান্তিক সংস্কৃতি। রক্তাক্ত হয়েছে প্রান্তিক জীবন। আজকের এই উত্তর আধুনিক যুগ তাই কেন্দ্র সংস্কৃতির আনুগত্য ভেঙে প্রান্তিক বহুত্বকে নব্য চেতনার দ্বারা পুনর্গঠিত করতে আগ্রহী। লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায় সেই কেন্দ্রবাসী দুরাত্মার দখল প্রবৃত্তি থেকে সরে গিয়ে যুগানুযায়ী প্রান্তিকের পুনর্জন্ম চাইলেন। উপন্যাসটিকে করে তুলতে চাইলেন প্রান্তিক সংস্কৃতির 'সেফটিনেট'।'' [৩৮]

মৃগয়া : কাল থেকে কালে...

বাংলা উপন্যাস ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা-পরবর্তী যে তরুণ ঔপন্যাসিকরা অবক্ষয়ী আধুনিকতার চোরাবালি পেরিয়ে, সময় সমাজ ও জীবনের নতুন ভাষ্য ধারা শোনাতে এলেন তাদের মধ্যে ভগীরথ মিশ্র একটি বিশিষ্ট নাম। গ্রামজীবনের কথাকার ভগীরথ মিশ্রের পাঁচখণ্ডের মহোপন্যাস 'মৃগয়া' প্রমাণ করেছে যে প্রকৃত অর্থে বাংলা উপন্যাসে এসেছে যুগান্তর। আর প্রমাণ করল

সত্তরের শেষে যে বীজগুলির অঙ্কুর দেখা গেল, আশিতে হল সেই সব অঙ্কুরের বৃক্ষায়ন আর নব্বইতে তা মহীরূহে পরিণত হল। পাঁচখণ্ডের উপন্যাস মৃগয়া।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়—১৯৯৬
দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়—১৯৯৭
তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়—১৯৯৮
চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়—১৯৯৯
পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হয়—২০০০

এই পাঁচটি খণ্ড কয়েকটি পর্বে বিভক্ত পর্বগুলি এরকম—

১ম খণ্ড— ক. পীড়ন পর্ব (পরিচ্ছেদ ১-২৭)
খ. দহন পর্ব (পরিচ্ছেদ ২৮-৫৯)

২য় খণ্ড— ক. খনন পর্ব (পরিচ্ছেদ ১-৩৬)

৩য় খণ্ড— ক. লুণ্ঠন পর্ব (পরিচ্ছেদ ১-৪১)

৪র্থ খণ্ড— ক. মন্থন পর্ব (পরিচ্ছেদ ১-২৪)
খ. ধর্ষণ পর্ব (পরিচ্ছেদ ২৫-৫৭)

৫ম খণ্ড— ক. বপন পর্ব (পরিচ্ছেদ ১-৩৭)
খ. সর্জন পর্ব (পরিচ্ছেদ ৩৮-৭৯)

সমাজেতিহাসের একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারাকে এই পাঁচখণ্ডে ধরা হয়েছে। তাই এই আটটি পর্ব আবার মোট ২৭৯টি উপশিরোনামে বিভক্ত হয়েছে।

- প্রথম খণ্ডে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের পটভূমিকায় এসেছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের প্রসঙ্গ
- দ্বিতীয় খণ্ডে এসেছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কথা, মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন এবং চীন-ভারত যুদ্ধের প্রসঙ্গ। চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের পর এল চৌষট্টির পঞ্চায়েত ভোট।
- তৃতীয় খণ্ডে যুক্ত হয়েছে উদ্বাস্তু সমস্যা ও আন্দোলনের বিষয়। এরই ভেতর এসেছে খরা, খাদ্যসংকট, যুদ্ধের কথা।

- চতুর্থ খণ্ডে আছে ষাটের দশকের শেষ প্রান্তে যুক্তফ্রন্ট গড়ার ইতিহাস, খাদ্য আন্দোলন, বেনামি জমি উদ্ধার প্রসঙ্গ এসেছে মন্থন পর্বে। সত্তরের দশক, নকশালবাড়ি আন্দোলন, গরিবী হঠাও, জরুরি অবস্থা এই পর্বে এসেছে সে-প্রসঙ্গও।

- পঞ্চম খণ্ডে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পর এবং দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার পর পার্টির কী আদর্শগত বিচ্যুতি ঘটেছে এই খণ্ডে আছে সে-প্রসঙ্গ। আশির দশকের পর নব্বই দশকের ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে শেষতম পর্ব সর্জন পর্ব।

'মৃগয়া' এক সুদীর্ঘকালের প্রতিবিম্ব। সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাল থেকে সাম্প্রতিক ভূমি-সংস্কার নীতির কাল পর্যন্ত কাহিনির বিস্তৃতি। এই সময়-পর্বের মধ্যেই কাহিনি গড়িয়ে গেছে চুয়ামসিনা-সিংহগড়-শালফাঁকি-দাপনজুড়ি-খেলেশোল-বৈচ্যা-বিষ্টুপুরের অসংখ্য মানুষের বিচিত্র জীবনচর্যার ভেতর দিয়ে। উপন্যাসের পটে উঠে এসেছে বিভিন্ন শ্রেণীর অসংখ্য চরিত্র, আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয় আদিবাসী, বাউরি, বাগদি, লায়েক এইসব নিম্নবর্গ অন্ত্যজ ব্রাত্য চরিত্রগুলির কথা। ঔপন্যাসিক নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন উপন্যাসের ধরতাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাল থেকে অর্থাৎ ১৭৯৩ সাল থেকে শুরু করে মোটামুটিভাবে পঞ্চমখণ্ডে পৌঁছেছে সমকালে, প্রায় বিশ শতকের নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত। এইসব নিয়ে উপন্যাসিটিকে বলা যায় প্রায় দুশো বছরের 'মানব মৃগয়া-বৃত্তান্ত'। লেখক বলেছেন—

> ''পাঁচখণ্ডে 'মৃগয়া' এমন একটি উপন্যাস যার বহিরঙ্গে এক শতাব্দীরও বেশী সময়কালের প্রেক্ষাপটে সামন্ততন্ত্রকেন্দ্রিক ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তারও তলায় রয়েছে মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তিজাত বৈশিষ্ট্যগুলির অন্বেষণ এবং সেই আদিম যুগ থেকে মানুষসহ এই পৃথিবীর জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণের প্রয়াস।'' [৩৯]

'মৃগয়া' উপন্যাসটিকে সামন্ততন্ত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস বলা যায়। উপন্যাসটিতে আমরা দেখি সামন্তপ্রভুরা কীভাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। এদেশের সামন্ততান্ত্রিক আবহ কেমন ক্রমান্বয়ী এবং সমস্ত প্রতিকূল শক্তিকে গ্রাস করতে সক্ষম হতে পারে তারই ইতিবৃত্ত এ উপন্যাস। সিংহগড় বা সিংহবাবুরা আবহমানকালের, তারা সারা বিশ্বের আধিপত্যবাদের প্রতিভূ। ল্যাতিন আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত তাদের মৃগয়াক্ষেত্র। উপন্যাসে লেখক এই পৃথিবীকে বিরাট একটি মৃগয়াক্ষেত্র রূপে দেখিয়েছেন। যেখানে খাদ্য-খাদকের অবিরাম লড়াই চলছে। সবল-দুর্বলের দ্বন্দ্ব চলছে। এই সূত্রে লেখক শোষণ ব্যবস্থার উৎস মূলে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখক এক জায়গায় বলেছেন—

''আমি তো এমনিতেই মার্কসবাদে বিশ্বাসী মানুষ। আমিও একটি শোষণমুক্ত দুনিয়ার স্বপ্ন দেখি। কিন্তু এই একটা বিষয়ে আমার মধ্যে সত্যি সত্যিই কিছু ধন্ধ রয়ে গেছে। ধন্ধটা এইখানেই যে, মানুষ যে একটা শোষণমুক্ত সমাজের কথা ভাবছে, তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরো সময়কালটিই তো একটা ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন শোষণের ইতিহাস ... শোষণ তো দেখতে পাচ্ছি, মানুষের একটা অতি প্রয়োজনীয় প্রবৃত্তি... মানুষের মনে এই প্রবৃত্তিটা যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন সে সুযোগ পেলেই তার চেয়ে দুর্বলকে শোষণ করবে। তাহলে পৃথিবীর বুক থেকে শোষণকে নির্মূল করতে হলে, মানুষের মন থেকেই শোষণের প্রবৃত্তিটিকে নির্মূল করতে হয়।''

লেখকের এই ভাবনারই প্রতিফলন 'মৃগয়া'। এক বৃহৎ ইতিহাসের পাশাপাশি উপন্যাসে ভগীরথ মিশ্র স্থানীয় ইতিাসেরও কথাশিল্প রচনা করেছেন। এই ইতিহাসের উপজীব্য নিম্নবর্গের মানুষজন। সমান্তরালভাবে সে-আখ্যানও এখানে কম বলিষ্ঠ বা জটিল নয়।

এই উপন্যাসে লেখক আমাদের দেশজ ধারাটিকে গ্রহণ করেছেন। 'বাংলা উপন্যাস তার জন্মলগ্ন থেকে প্রতীচ্যের মডেলের অনুসারী। দেশজ ধারার দৃষ্টান্ত এখানে একেবারে অমিল না হলেও বিরল, ভগীরথ মিশ্র এখানে উপন্যাসের ভারতীয় মডেল নির্মাণের স্বেচ্ছাব্রত গ্রহণ করেছেন। এবং উপকথা, লোককথা এবং কথকতার আদলে বৃত্তান্তধর্মী আখ্যান রচনার ভারতীয় ধারায় সিদ্ধিলাভ করেছেন।' কারণ লেখক জানতেন বিশাল এই ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাস পুরাণ লোকগাথা কিংবদন্তি, মঙ্গলকাব্য মাটি মানুষ আর তাদের স্বতন্ত্র জীবনচর্যার উপরেই গড়ে উঠতে সক্ষম আমাদের নিজস্ব সাহিত্য। লেখক দেখিয়েছেন ভারতবর্ষ গ্রামে বাস করে এবং গ্রামই তার স্বদেশ, গ্রামই তার শিকড়। এ প্রসঙ্গে লেখক তাঁর সময়ের প্রতি দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেছেন যদিও তাঁর সমকালে লেখকদের নিজ সময়ের প্রতি অবহেলা তাঁকে পীড়িত করে সাহিত্যের প্রেক্ষাপট হিসেবে নগরকেন্দ্রিকতা সম্পর্কে লেখক বলেন, এই সময়ের সাহিত্যে—

''দৃষ্টি বিবেচনার বাইরে থেকে গেল আর এক দশক জুড়ে মানবতার অবিশ্রাম কান্না-হাহাকারগুলিকে নিপুণ বধিরতায় বেমালুম এড়িয়ে গিয়ে, স্রেফ প্রেমকামের গল্প লিখে লিখে শেষ হয়ে গেল দু'দুটো দশক... সেইসব গল্পের অধিকাংশই নাগরিক মধ্যবিত্তের গল্প, তখন বঙ্গদেশের কথাশিল্পের মানচিত্র থেকে গ্রামবাংলা পুরোপুরি উধাও। আমি এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের মতো বিশাল গ্রামটিকে বসে গ্রামের গল্প না লিখলে লেখকের কলমশুদ্ধি হয় না।'' [৪০]

উপন্যাসে সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ সিংহবাবুদের প্রতাপের জাল বিছানো ছিল এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। চুয়ামসিনা তার কেন্দ্রস্থল। উনিশ শতকের শেষপাদের জাতক এই সামন্তপ্রভুদের আয়ুষ্কাল ছিল বিশ শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত। যদিও এই উপন্যাসের পাঁচটি খণ্ডেই তাদের উপস্থিতি আছে নানাভাবে। উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই সিংহ বংশধারার পাশাপাশি পাওয়া যাচ্ছে বাউরিদের বংশধারা যাদের সঙ্গে সিংহবাবুদের দ্বান্দ্বিকতার সম্পর্ক চিরবর্তমান। এই সিংহবাবুদের মৃগয়াভূমিতে একদা সংগঠিত ও সংঘটিত হয়েছে লায়েক বিদ্রোহ, চুয়ার বিদ্রোহ। বাউরি, শিকারি, লায়েকদের বংশধরেরা সেকথা অতিকথা ও গল্পকথা স্মরণে রাখে।

উপন্যাসে জঙ্গল হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি—

> ''শেকলের মতো লাগোয়া জঙ্গলগুলোর মাঝে মাঝে চাকবন্দী বাইদ জমিন। রুক্ষ্ম মাকড়া পাথরে মোড়া কল্লাচ্ ডাঙা। উঁচুনীচু আদিগন্ত ডিহি, খাঁ খাঁ ভুতুড়ে মাঝে মাঝে দু'চারটা তাল কিংবা বাবলা এরই মাঝে জঙ্গলের গা ঘেঁসে ছোট ছোট বসতি গ্রাম। লায়েক, লোহার, খয়ারা, বাউরি, সর্দার, শিকারে আর মাদোড়দের পুরুষানুক্রমে বসবাস।''

—এদের ওপর আধিপত্য কায়েম রাখছে সিংহবাবুরা। অর্জুনপুর, লায়েক বাঁধ, শালুকা এমনকি বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন থানায় তাদের তালুক ছড়িয়ে আছে। লেখক রাঢ় বাংলার নানা শ্রেণীর অসংখ্য মানুষের জীবনগাথা, তাদের উপর আধিপত্যবাদী উচ্চবর্গের অত্যাচার আর তার বিরুদ্ধে নীচের স্তরের প্রতিবাদ প্রতিরোধকে ভাষা দিয়েছেন উপন্যাসে। স্বাধীনতাপূর্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সামন্ত-ব্যবস্থার পীড়ন পর্ব থেকে বিস্তৃত সাম্প্রতিক ভূমিসংস্কার আন্দোলনের বপন পর্ব পর্যন্ত। নিম্নবর্গের বিদ্রোহ প্রতিবাদকে ভাষা দিয়েছেন লেখক এইভাবে। নিরন্তর পীড়নের এক আতঙ্কে যন্ত্রণায় কেটেছে নিশান বাউরির কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়ত্ব, তা উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তেছে পুত্র পরীক্ষিতের ওপর। উপন্যাসের প্রথম পর্বে সুদর্শন সিংহবাবুর মনে হয়েছে—'নিশান বাউরি মরণকালে কেবল তার যন্ত্রণাটাই দিয়ে যায়নি ব্যাটা পরীক্ষিত বাউরিকে, দিয়ে গেছে বুঝি তার যাবতীয় রোষান্ধ আগুন'। এই পরীক্ষিতই সিংহবাবুদের উত্তরসূরি প্রিয়ব্রতের মগজে প্রথম ঢুকিয়ে দিল গ্রামবাংলার উৎপাদন ব্যবস্থা ও শোষণের মূল সূত্রগুলি। এই ভাবনা থেকেই প্রিয়ব্রত যোগ দিয়েছিল সাম্যবাদী আন্দোলনে।

'মৃগয়া' শুধু সুদর্শন সিংহবাবুদের পরিবারের ইতিবৃত্ত নয়। সুদর্শনের ভাই প্রতাপলাল ও তার ছেলে হরবল্লভও এই একই অত্যাচার পীড়ন ও লুণ্ঠন চালিয়েছে। উপন্যাসের বর্তমান সময়ে হরবল্লভ শাসকদলের 'সোল এজেন্ট'। দুর্গত, অসহায় গ্রামবাসীদের জন্য ব্লক অফিস থেকে যে

সব ত্রাণ সামগ্রী আসে সেই সব কিছুই—ঢালু পথ বেয়ে যথাসময়ে বিলি বিতরণের উদ্দেশ্যে পৌঁছে যায় সিংহগড়ে, গুদামজাত হয়। হরবল্লভই লিস্টি বানান। তাঁর হুকুমেই মাল বিলি হয়।' ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার ভূমিসংস্কারের প্রস্তাব রেখেছিল। তবুও ১৯৬৯ পর্যন্ত জমিদারি প্রথা বজায় ছিল। আইনের ফাঁক-ফোকরগুলিকে সেটেলমেন্ট অফিসের সহায়তায় নিপুণভাবে ব্যবহার করে তারা। নিজেদের সম্পত্তি বাঁচায় এইভাবে—কোথাও তা দেবোত্তর করে সেবাইত হয় সিংহবংশ কোথাও জমিতে অবাঞ্ছিত গাছ লাগিয়ে বাগান বলে চালানো হয়। আবার মুনিস মাইন্দারের নামে রাখা হল প্রচুর জমি। পুরোনো চেক বইতে বন্দোবস্তের রসিদ কেটে জমিদারি উচ্ছেদ আইন পাশ হওয়ার আগের তারিখ বসিয়ে, আর চুয়ামসিনায় জমিদার হরবল্লভই হয় লায়েক বাঁধ পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট। ফলে কংগ্রেস আমলে পুরোনো জমিদারদের প্রতাপ তো কমলই না বরং তাদের আয়ের উৎস বেড়েছে। জমিদার প্রেসিডেন্ট হয়ে, সমস্ত স্কুল পরিচালনার ভার নেন, সমিতির সভাপতির দায়িত্বে থাকেন প্রেসিডেন্ট। ফলে জমিদারের ছেলেদের হাতে চলে যায় রাস্তা বানানোর কাজ, সেচ প্রকল্প তৈরির কাজ, স্কুলের শিক্ষকতা এমনকি ত্রাণ প্রকল্পে লঙ্গরখানা চালানোর দায়িত্ব। ফল যা হবার তাই হয়, বঞ্চিত হয় গরিব হতভাগার দল। আর এসব দেখে স্বাধীনতা সংগ্রামী অনাথবন্ধুর মনে জাগে স্বাধীনতার প্রত্যাশা-প্রাপ্তির বেদনা। নেমে আসে নৈরাশ্য আর নৈরাজ্য। গোপনে সংঘটিত হতে থাকে কমিউনিস্টরা।

> ''জমিদারি উচ্ছেদ আইনের অকার্যকারিতা, বাংলায় কংগ্রেসের জন্ম ও বামপন্থীদের গোপন সাংগঠনিক সক্রিয়তা ক্রমশ রাজনৈতিক পালাবদলের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে দুভাগ হয়ে গেল। জরুরি অবস্থা, মিসা আইন প্রয়োগ, কংগ্রেসি যথেচ্ছাচার শুধু বিরুদ্ধ জনমত গড়ে তোলেনি, পরিণামে ১৯৬৭ সালে চোদ্দ দলের যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করল। রাজ্যের ক্ষমতা দখলের জন্য বামপন্থীরা সে সময় সাংগঠনিকভাবে পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারেনি। তবু এই সাফল্য গ্রামসমাজ বিশেষ করে নিম্নবর্গের মধ্যে একটা উচ্ছ্বসিত উল্লাসের জন্ম দিল।'' [৪১]

এরপর পার্টি যাবতীয় বেনামি জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে দৃঢ়সংকল্প হয়। গামীরতলা জঙ্গলের ওপারে আস্তাশোলের পুরোজমির ধান কেটে নেয় ওরা। আর উচ্চবর্গীয়দের অপমান আর হেনস্থার নেতৃত্ব দিয়ে এককভাবে নিম্নবর্গীয়দের প্রতিশোধ বাসনাকে চরিতার্থ করে লোকপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে বাঁশি বাউরি। তাদের মধ্যে দীর্ঘ লড়াইয়ের কোনো প্রস্তুতি এই সময়ে এদের মধ্যে লক্ষ করা গেল না। তাই এসব থেকে পরীক্ষিত বাউরি নিজেকে

সরিয়ে নিল। ঔপন্যাসিক এখানে উপস্থাপন করেছেন উচ্চবর্গীয় প্রশাসন এবং নিম্নবর্গীয় কর্মচারিদের যাবতীয় ভণ্ডামি। মৃগয়া উপন্যাসের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে আমলাতন্ত্রের ব্যঙ্গচিত্র। গণতন্ত্র ক্রমশ বৈশ্যতন্ত্রে পরিণত হচ্ছে, বারো আনা নিরক্ষর কুসংস্কারগ্রস্ত চেতনাহীন দরিদ্র মানুষের দেশে ভোটভিত্তিক রাজনীতি করবার পাশাপাশি মার্কসবাদী চেতনার বিকাশ ঘটানো যে কী কঠিন ব্যাপার সেটা বুঝেই নেতৃত্ব জনমনোরঞ্জনের কতকগুলি সহজ উপায় বের করে ফেলেছে। উপন্যাসে দেখি মধ্যবর্গের চরিত্রগুলিও শ্রেণিচ্যুত হয়ে স্থানীয় ইতিহাসের উপাদানে নিজেদের পরিণত করে। আমরা দেখলাম মৃগয়ার ক্যানভাসে একটা সুদীর্ঘ সময়ের আঁচড় পড়ল জমিদার থেকে বাউরি প্রজা, আমলা থেকে পার্টিকর্মী—বিচিত্র সব মানুষ যেন বলে চলেছে তাদের নিজের কথা তাদের নিজেদের ভাষায়। আঞ্চলিকতার স্পর্শপুষ্ট এই ভাষাশরীর নির্মাণে ভগীরথ মিশ্রের কৃতিত্ব অতুলনীয়। সামন্ততন্ত্রের পীড়ন, নায়েক বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, স্বদেশি আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট আদর্শ, নকশাল আন্দোলন, আমলাতন্ত্র, নিম্নবর্গীয়দের জীবনাচরণ সবকিছু মিলিয়ে প্রায় এক শতকের বাংলার আর্থসামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক শরীর এই উপন্যাস। তবে শুধু দেশকালই নয়, এর পটে ধৃত মানুষগুলিও জীবন্ত রূপ লাভ করেছে। এইভাবে সরযূর বৈকল্য, নিশান বাউরির নির্বাক প্রতিবাদ, তিলক অগ্নি উপাখ্যান, বুদ্ধদেবের সততা, পাগল শিকারির সুধন্য সন্ধান, গোরাচাঁদের সংকট, সুকুমার আচার্যের বোধ : সবই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন গভীর সততায়। আসলে পৃথিবীর যেখানে যত শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও বর্গসংঘাত সংঘটিত হয়েছে ও হচ্ছে, তার সঙ্গে মৃগয়ায় বর্ণিত সাবলটার্নদের লড়াই একীভূত হয়ে গেছে। ভূমিমানবদের জীবন ও লড়াই এ উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। শুধু চুয়ামসিনার সিংহবাবুরাই নয়। প্রতিটি এলাকায় এমন ডজন ডজন সিংহবাবু যুগ যুগ ধরে এমনই অভিনব উপায়ে ভূমিলুণ্ঠনে রত। যদিও বিভ্রান্ত সময়ের কথাকার ভগীরথ মিশ্র, তবুও আমরা দেখি উপন্যাসে সেই বিভ্রান্ত সময় থেকে উত্তরণের স্বপ্নচিত্রও তিনি অঙ্কন করেছেন। অমলজ্যোতির উপলব্ধিতে লেখক বলেছেন ‘এদেশের অধিকাংশ মানুষ নিজেদের ভাড়া বাড়ির বাসিন্দা বলে জ্ঞান করে’। সুকুমার এর কারণ ব্যাখ্যা করেছে ‘এ দেশের মানুষকে কখনও বোঝানোই হয়নি যে দেশটা তাদের’। আবার এই সুকুমারকেই আমরা দেখি, সব ছেড়ে উন্মুক্ত আকাশের তলায় বসে মানুষ গড়ার কাজে লাগে, নতুন স্বপ্ন দেসে। পুলকেশদাকে বলে—‘একদল লোভী আর সুপ্ত শোষককে সাথে লিয়ে বালির প্রাসাদ গইড়্বার মস্করাটা আর ভালো লাগছে নাই... আমি আবার নতুন স্বপ্নের মধ্যে ডুবতে চাই’। এ তো লেখকের কণ্ঠস্বর, সময়ের কণ্ঠস্বর, শুভবোধ সম্পন্ন মানুষের কণ্ঠস্বর। দেশ কালের ঊর্দ্ধে গিয়ে আজও আমরা এ স্বপ্নে বিভোর হয়ে যাই।

আলোচিত-অনালোচিত উপন্যাসের একটি তালিকা

চোট্টিমুণ্ডা ও তার তীর ১৯৮০ টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা ১৯৮৭	মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬)
তিস্তাপারের বৃত্তান্ত ১৯৮৮	দেবেশ রায় (১৯৩৬)
আত্মপরিচয় ১৯৯০	আফসার আমেদ
আঁধার মহিষ, ছায়ার পাখি, ১৯৯৩ বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর ১৯৯৫ রহুচণ্ডালের হাড় ১৯৯৫	অভিজিৎ সেন
বিবির তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা ১৯৯৫	আফসার আমেদ
জলতিমির ১৯৯৭	সাধন চট্টোপাধ্যায়
সানুআলির নিজের জমি ১৯৯৮	আফসার আমেদ
মাটির অ্যান্টেনা ২০০০	সাধন চট্টোপাধ্যায়
চারণভূমি ১৯৯৪	অভিজিৎ সেন (১৯৪৫)
মৃগয়া ২০০০ প্রথম খণ্ড—১৯৯৬ দ্বিতীয় খণ্ড—১৯৯৭ তৃতীয় খণ্ড—১৯৯৮ চতুর্থ খণ্ড—১৯৯৯ পঞ্চম খণ্ড—২০০০	ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭)

তথ্যসহায়কসূত্র

১. শুভশ্রী, নিম্নবর্গের মানুষ বাংলা কথাসাহিত্য, পৃষ্ঠা—১২৭।

২. সত্তর দশক, অনুষ্টুপ, মহাশ্বেতা দেবী, সত্তর দশক এবং তারপরে, পৃষ্ঠা—৪৩।

৩. ঐ, পৃষ্ঠা—৪৫।

৪. ভেরিয়ার এল্যুইন-এর আদিবাসী জগৎ, অনু. মহাশ্বেতা দেবী ও পৃথ্বীশ সাহা, সাহিত্য আকাদেমি ২০০০, পৃষ্ঠা—৩২৪।

৫. গল্প সারণি, মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, পৃষ্ঠা—২১৩।

৬. মহাশ্বেতা দেবী, টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা, প্রমা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৯, উপন্যাসের সকল উদ্ধৃতি বইটি থেকে গৃহীত।

৭. অভিজিৎ সেন, 'কি লিখি—কেন লিখি', কোরক শারদীয়, ১৩৯৭।

৮. অভিজিৎ সেন, 'উপন্যাস ভাবনা' এবং মুশায়েরা, কার্তিক-চৈত্র ১৪০৩।

৯. অভিজিৎ সেন, রহুচণ্ডালের হাড়, জে এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১০, উপন্যাসের সব উদ্ধৃতি এই গ্রন্থটি থেকে গৃহীত।

১০. অরুণ কুমার ঘোষ, 'ইপ্সিত প্রকরণের ঐকান্তিক সন্ধানে : দেবেশ রায়ের তিনটি উপন্যাস', বাংলা উপন্যাস : বীক্ষা অন্বীক্ষা, এবং মুশায়েরা, সম্পা. সুবল সামন্ত, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা—১৮৮।

১১. দেবেশ রায়, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৮, ষোড়শ সংস্করণ, জুলাই ২০১১, পৃষ্ঠা—পরিশিষ্ট ৪৯৭।

১২. ঐ, পৃষ্ঠা—৪৪৮।

১৩. ঐ, পৃষ্ঠা—৪৫৩।

১৪. ঐ, পৃষ্ঠা—৪৯৫।

১৫. ঐ, পৃষ্ঠা—৩৭।

১৬. জহর সেনমজুমদার, উপন্যাস : সময় সমাজ সংকট, পৃষ্ঠা—২৭৫।

১৭. তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, পৃষ্ঠা—৩৯।

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা—৬৪।

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা—১৭৭।

২০. জহর সেনমজুমদার, ঐ, পৃষ্ঠা—২৮০।

২১. তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, ঐ, পৃষ্ঠা—১৭৫, ১৮৯।

২২. ঐ, পৃষ্ঠা—২৮১।

২৩. ঐ, পৃষ্ঠা—২৯০।

২৪. ঐ, পৃষ্ঠা—২৯৯।

২৫. ঐ, পৃষ্ঠা—৩২০।

২৬. ঐ, পৃষ্ঠা—৪১৬।

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা—৪২৩।

২৮. ঐ, পৃষ্ঠা—৪২২।

২৯. ঐ, পৃষ্ঠা—৪৩৬।

৩০. ঐ, পৃষ্ঠা—৯৫।

৩১. ঐ, পৃষ্ঠা—১৮৪।

৩২. ঐ, পৃষ্ঠা—৪৫৬।

৩৩. ঐ, পৃষ্ঠা—৫০৪।

৩৪. কোরক, 'কেন লিখি', সাধন চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা—১৪৩।

৩৫. সাধন চট্টোপাধ্যায়, 'অক্ষরে বদ্ধ জীবন'।

৩৬. জহর সেনমজুমদার, ঐ, পৃষ্ঠা—৩৫৫।

৩৭. নীললোহিত পত্রিকা, দশম সংখ্যা।

৩৮. জহর সেনমজুমদার, ঐ, পৃষ্ঠা—৩৬৪।

৩৯. অমৃতলোক, ১০৬, জানুয়ারী ২০০৬।

৪০. শিল্পভাষা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০০৩, সাক্ষাৎকার।

৪১. এবং মুশায়েরা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা—১১৫।